রুদালী

রুদালী

মহাশ্বেতা দেবী

দে'জ পাবলিশিং॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

RUDALI
COLLECTION OF STORIES
BY MAHASWETA DEVI
Published by : Dey's Publishing,
13 Bankim Chatterjee Street.
Calcutta-700073. Rs 25

প্রকাশক :
সুভাষ চন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ISBN 81-7079-452-8

দাম : ২৫ টাকা

এই লেখকের আরও কয়েকটি বই

মার্ডারারের মা

হিরো : একটি ব্লু-প্রিন্ট

ক্ষুধা

অরণ্যের অধিকার

আঁধাব মানিক

গনেশ মহিমা

অগ্নিগর্ভ

নৈঋতে মেঘ

হাজার চুরাশির মা

ইটের পর ইট

মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প

স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প

তালাক ও অন্যান্য গল্প

হাজার চুরাশির মা (নাটক)

নীলছবি

গ্রামবাংলা (১ম)

গ্রামবাংলা (২য়)

কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু

টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা

লায়লি আশমানের আয়না

শালগিরার ডাক

স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়কে—
যাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম আমাকে
অনুপ্রাণিত করে চলে—

গল্প ক্রম

রুদালী

টাহাড় গ্রামটিতে গঞ্জু ও দুসাদরা সংখ্যাগুরু। শনিচরী জাতে গঞ্জু। গ্রামের আর সকলের মত শনিচরীর জীবনও কেটেছে অসুমার দারিদ্র্যে। শনিবারে জন্মেছিল বলে ওর কপালে এত দুঃখ, একথা এতদিন ওর শাশুড়ি বলত। যতদিন বলত, তখন শনিচরী ছিল বউ। মুখ তেমন খোলেনি। শাশুড়ি যখন মরে তখনো শনিচরী বউ মানুষ। শাশুড়িকে জবাবটা ওর দেওয়া হয়নি। এখন মাঝে মাঝেই ওর কথাটা মনে পড়ে। একা, আপন মনে ও বলে, ওঃ! শনিবারে জন্মালে শনিচরী নাম হয়, বউ অপয়া হয়। তুমি তো সোম্‌রি ছিলে, কোন সুখে জীবনটা কাটল? সোম্‌রি, বুধুয়া, মুংরি, বিস্‌রি, কার জীবনটা সুখে কাটে?

শাশুড়ি মরতে শনিচরী কাঁদেনি। ওর বর আর ভাশুর, শাশুড়ির দুই ছেলেকেই হাজতে পুরেছিল মালিক মহাজন রামাবতার সিং। এক টাল গম চুরি যেতে রামাবতার এমন ক্ষেপে যায়, যে টাহাড়ের

যত দুসাদ, যত গঞ্জু পুরুষ, সকলকেই দেয় জেলে পুরে। শাশুড়ি শোথজ্বরে ভুগে ভুগে, খেতে দে! খেতে দে! বলতে বলতে হা অন্ন! জো অন্ন! বলতে বলতে মরে গিয়েছিল হেগে মুতে। ঝিমঝিমে বর্ষার রাত ছিল। শনিচরী আর তার জা মিলে বুড়িকে মাটিতে নামিয়েছিল। রাত পোহালে দোষ লেগে যাবে, ঘরে নেই এক খুঁচি গম, প্রায়শ্চিত্তের কড়ি আসবে কোত্থেকে? রাতের মড়া যাতে রাতে বেরোয় সে জন্যে শনিচরীই সেই বর্ষার রাতে প্রতিবেশীদের ডাকতে বেরিয়েছিল। হাতে পায়ে ধরে সকলকে আনতে, বুড়িকে দাহ করার ব্যবস্থা করতে শনিচরী এত ব্যস্ত ছিল, যে কাঁদবার সময় হয়নি। হয়নি তো হয়নি! বুড়ি যে জ্বালা দিয়ে জ্বালিয়ে গেছে, কাঁদলেও তো শনিচরীর আঁচল ভিজত না।

বুড়ি একলা থাকতে পারত না জীয়ন্তে। মরেও একা থাকতে পারেনি। তিন বছর যেতে না যেতে ভাশুর, জা, সবাই সাফ। রামাবতার সিং তখন গ্রাম থেকে দুসাদদের, গঞ্জুদের তাড়াবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে। তাড়িয়ে দেবে রামাবতার, সেই ভয়েই শনিচরী তখন কাঁটা হয়ে থাকত। ভাশুর আর জা মরতেও কাঁদা হয়নি। কাঁদবে, না লাশ জ্বালাবার, সস্তায় শ্রাদ্ধ সারবার কথা ভাববে? এ গ্রামে দুঃখী মানুষ সবাই। প্রতিবেশীর দুঃখ বোঝে। তাই টক দই, ভুরা চিনি আর ধেনো চিড়ে পেয়ে খুশি হয়ে যায়। শনিচরী আর ওর বর যে কাঁদেনি, তাতেও সবাই বলে, কাঁদতে কি পারে এখন? তিন বছরে তিনটে মরল। চোখের জল বুকে পাথর হয়ে জমে যাচ্ছে! শনিচরী মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। মালিক হজৌরের খেত ঠেঙিয়ে যে খুদকুঁড়ো আনা, তাই এতগুলো মানুষের সম্বল। দুটো মানুষ মরল, ভাল হল। নিজেরা পেট ভরে খাবে!

স্বামী মরতে কাঁদবে না, তা তো ভাবেনি শনিচরী! অথচ, এমন কপাল ওর ঠিক তাই ঘটল। তখন ওদের একমাত্র ছেলে বুধুয়া

বছর ছয়েকের। শনিচরী ছেলেকে ঘরে রেখে অসীম উদ্যমে, সংসারটা বেঁধে তোলবার জন্যে, চলে যায় মালিকের বাড়ি। দমাদম্ কাঠ চ্যালা করে দেয়, গরুর ঘাস এনে দেয়, ফসলের মৌসুমে স্বামীর সঙ্গে খেতে গিয়ে ফসল কাটে। ভাশুরকে তার শ্বশুরের দেওয়া জমিটুকুতে ঘরখানা সবে তুলেছে দুজনে। দেওয়ালে শনিচরী চিত্র এঁকেছে। উঠোনে বেড়া দেবে বুধুয়ার বাপ, উঠোনে লঙ্কা, বেগুন আবাদ করবে। শনিচরী হুজুরাইনের কাছ থেকে বকনা বাছুর পালানি নেবে, সব ঠিক। শনিচরীর বর বলল, চল, তোহরিতে বৈশাখী মেলা দেখে আসি। শিবঠাকুরকে পূজাও দেব। সাতটা টাকা তো জমেছে।

মেলা খুব জমেছিল। বড় বড় রহিস লোকরা শিবের মাথায় ঢালছিল ঘড়া ঘড়া দুধ। সেই দুধ কয়েকদিন ধরে মাটিকাটা চৌবাচ্চায় জমছিল। টক দুর্গন্ধ উঠছিল দুধ থেকে, মাছি ভনভন করছিল। পাণ্ডাকে টাকা দিয়ে সেই দুধ গেলাস গেলাস খেয়ে অনেকের হায়জা হয়, অনেকে মরে। বুধুয়ার বাপও মরেছিল হায়জায়। তখনো আংরেজরাজ। গোরমেনের লোক সব হায়জা রোগীকে টেনে টেনে হাসপাতালের তাঁবুতে নি...ছিল। তাঁবু মাত্র পাঁচটা। রুগী ষাট সত্তর জন। তাঁবুর চারদিকে ছিল কাঁটাতারের বেড়া। শনিচরী আর বুধুয়া বেড়ার এ পাশে বসেছিল। বসে বসেই শনিচরী জেনে যায়, বুধুয়ার বাপ মরে গেল। কাঁদতে সময় দেয়নি গোরমেনের লোক। লাশগুলো তারাই জ্বালায়। শনিচরী আর বুধুয়াদের টেনে নিয়ে গিয়ে হাতে কলেরার সুঁই দেয়। তাতে যা ব্যথা হয়, সেই ব্যথাতেই মা ছেলে খুব কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে শনিচরী কুরুডা নদীর তিরতিরে জলে স্নান করে মেটে সিঁদুর মুছে, হাতের চুড়ি ভেঙে গ্রামে ফেরে। গালার চুড়িগুলো নতুন। মেলায় গিয়ে পরেছিল। তোহরিতে শিবমন্দিরের এক পাণ্ডা বলে, এখান থেকে আদ্যপিণ্ড দিয়ে যা। বিভুঁয়ে এসে

মরল বুধুয়ার বাপ। — তার কথাতে, পাঁচ সিকে দক্ষিণা দিয়ে বুধুয়ার হাত দিয়ে বালি আর সত্তুর পিণ্ড দেওয়ায় শনিচরী। কিন্তু তা নিয়ে গ্রামে কি কম ঝড় উঠেছিল! মোহনলাল ব্রাহ্মণ, রামাবতারের স্থাপিত বিগ্রহের সেবক, সে বলেছিল, ওঃ! বালির পিণ্ডি নদীর জলে! বুধুয়া যেন রামচন্দ্র। বালি দিয়ে দশরথের পিণ্ড দিচ্ছে!

বরাম্ভোন বলল যে!

তোহ্‌রির ব্রাহ্মণ জানবে টাহাড়ের মানুষের কিরিয়াকরণের নিয়ম? তার কথায় পিণ্ডি দিয়ে তুই আমার মাথাটা হেঁট করে দিয়ে এলি তো?

মোহনলালকে তুষ্ট করতে, রামাবতারের কাছে ''পাঁচ বছর খেতে বেগারী খেটে পঞ্চাশ টাকা শোধ করব'' খতে টিপ্‌সই দিয়ে কুড়ি টাকা নিতে, সে টাকায় বুধুয়ার বাপের শ্রাদ্ধ করতে, শ্রাদ্ধ মিটতে কচি ছেলে নিয়ে হা ভাত! জো ভাত! করতে এমন ব্যস্ত থাকে শনিচরী, যে বুধুয়ার বাপের জন্যে আর কাঁদা হয়নি। একদিন ঘোর গ্রীষ্মে পুড়তে পুড়তে রামাবতারের খেতে নিড়িনি দিতে দিতে শনিচরী হঠাৎ নিড়িনি ফেলে একটা পিপল্‌ গাছের ছায়ায় বসেছিল গিয়ে। অন্য মজুরদের বলেছিল, আজ আমি বুধুয়ার বাপের জন্যে কাঁদব। বুক ফাটিয়ে কাঁদব।

আজই কাঁদবি কেন? — দুলন গঞ্জু বলেছিল।

তোরা মজুরি নিয়ে ঘর যাবি। আমি খত লিখে বসে আছি। আমি যাব চাবটি ভুট্টার ছাতু নিয়ে। তাই কাঁদব। আমার কান্না পায় না?

সেই দুঃখে কাঁদবি। এতোয়াকে টানছিস কেন?

তু বহোৎ খচড়াই লাটুয়াকে বাপ।

হিসেব করে দেখেছিস? এক বছর হয়ে গেল।

এক সাল!

হাঁ রে।

এক সাল সে নেই?

পেটের জ্বালায় সময় যায়।

আমি যদি মরতাম।

বুধুয়া কোথায় যাবে? পাগলামি করিস না। শোন্ খত যা লিখেছিস তা লিখেছিস। এখন দেখ, আমি কাজ করি জিরিয়ে জিরিয়ে। যদ্দিন কাজ, তদ্দিন মজুরি। তুই জান লড়িয়ে ও হারামীর খেত সাফ করছিস কেন? জিরেন নে। যদ্দিন কাজ, তদ্দিন জলখাই।

সেদিনও শনিচরীর কাঁদা হয়নি।

গ্রামসমাজে সব কিছু সকলের চোখে পড়ে। শনিচরী যে কাঁদেনি, তা নিয়ে অনেক কথা হয়। শনিচরী সে সব কথা কানেও নেয়নি। রামাবতার সিংয়ের খতের টাকা শোধ হচ্ছিল না, বোধ হয় শোধ হতও না। কিন্তু শনিচরী তখন একটা কালো এঁড়েকে দেখাই ভালাই করছিল। আসরফির মা ওর হেফাজতে এঁড়েটা রেখে গয়াজী গিয়েছিল। তখনি রামাবতারের খুড়ো মরে, আর মৃত্যুকালে ওই এঁড়েটার ল্যাজ বুড়োকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বৈতরণী পারের অব্যর্থ ওষুধ। শনিচরী দেখে ঘরে অনেক লোক। রামাবতারের কুটুম স্বজন সব। শনিচরীর মাথায় হঠাৎ খচড়াই খেলে। সে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলে, গোড় লাগি গরিবের মা বাপ! গরিব শনিচরী আপনাদের সেবায় লাগল আজ! তা একটা আর্জি। সে খতের টাকা শুধে গেছে বলে লিখে দিন!

খুড়ো মরা মানে আরো পঞ্চাশ বিঘা সরেস জমি হাতে আসা। রামাবতার কি জানি কেন, শনিচরীর কথা মেনে নেয। এ নিয়ে পরে রামাবতারকে অনেক কথা শুনতে হয়। অন্য জোতদার মহাজনরা বলেছিল, খতের টাকা শোধ গেছে বলে মেনে নিল যখন,

তখন থেকে অছুৎদের রবরবা বেড়ে চলেছে। টাকাটা কিছু নয়। নাগরার ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন। কিন্তু খতটা হল সেই জোয়াল, যা কাঁধে নিয়ে বলদগুলো খেটে চলে।

রামাবতার বলত, খুড়ো মরছে, মনে দুঃখ, খুব উদাস লেগে গিয়েছিল ভাই। মনে হচ্ছিল, যে যা চায়, তাকে তাই দিয়ে নিজে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাই।

রামাবতারের ছেলে লছমনের যখন বিয়ে হয়, তখন রামাবতার শনিচরীদের কাছ থেকে বিয়ের বাদ্যিবাজনার খরচ আদায় করেছিল।

এই সব ভাবতে ভাবতে আর পেটের ধান্দা করতে করতে শনিচরী কাঁদতে ভুলে যাচ্ছিল। বুধুয়া বড় হল। বাপের মতই দারিদ্র্যের জোয়াল কাঁধে নিল। বিয়ে হয়েছিল শৈশবে। বউ ঘর করতে এল। বুধুয়ারও ছেলে হল একটা। বউ যেন ডাইনি। হাটের মানুষদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে কি খেয়ে আসত কে জানে! দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠল বউ। রামাবতারের ছেলে লছমনের গমের বোঝা বইতে বইতে বুধুয়াকে ধরল চেনা রোগে। খোঁখী রোগ। যক্ষ্মা। রাতে জ্বর হয়, ভোরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। কাশির সঙ্গে রক্ত। চোখের নিচে কালি। দেখে দেখে শনিচরীর বুকে চিতার আগুন হা হা করে আকাশ পানে ছড়িয়ে দেয় যে বাতাস, সেই বাতাস বইত। বুধুয়ার দিকে চাইলেই শনিচরী বুঝতে পারত। বুধুয়াকে আঁকড়ে ধরে সংসারটা বেঁধে তোলার আকাঙ্ক্ষাটাও তার পুরবেনা। ছোট আকাঙ্ক্ষাগুলোও পূর্ণ হয়নি ওর। কাঠের কাঁকই কিনবে একটা, কেনা হয়নি। গালার চুড়িগুলো এক বছর হাতে রাখবে, রাখা হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার চেহারা বদলায়। ছেলে বউ কামাই করবে। ওদের মেহনতের অন্ন শনিচরী খাবে, শীতের রোদে বসে নাতির সঙ্গে এক সানকি থেকে খাবে ছাতু ও গুড়। এই আকাঙ্ক্ষাটা বড্ড বড় মাপের হয়ে গিয়েছিল

কি? সেই জন্যেই কি বুধুয়া এখন তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে?

বউয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে, ওকে দোষ দিতে গিয়েও পারত না শনিচরী। বুধুয়ার বউ, নাতির মা তাকে কেমন করে রুক্ষ কথা বলে শনিচরী? বুধুয়া সবই বুঝত। একদিন বলেছিল, মা ওকে কিছু বলিস না।

কাকে?

তোর বউকে।

এ কথা বললি কেন?

বুধুয়া শীর্ণ ও শুভ্র হাসি হেসেছিল। বলেছিল, মা! ও হাটে সব বেচতে গিয়ে পয়সা চুরি করে? এটাসেটা কিনে খায়, সবই তো জানি। ভুখের জন্যে করে মা।

ওকে কি আমি খেতে দিই না?

ওর খিদেটা বেশি যে!

মানুষ কত কথা বলে।

জানি মা। কেন বলে তাও জানি। কিন্তু আমার আর এ নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে না। য়ো কা জানেগী মা, তুই আর আমি কত কষ্টে সংসারটুকু...

বুধুয়া কাশতে শুরু করেছিল। শনিচরী ওর বুকে হাতে বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, ভগবানকে আর ডাকি না রে। ভগবান থাকলে তোর ব্যামো আমাকে দিত।

না মা। তুই থাকলে আমার ছেলে বাঁচবে।

আমি যে আমার ছেলে বাঁচা চাই!

কপাল চাপড়ে উঠে গিয়েছিল শনিচরী। উঠোনে আলো করে দিয়েছে বুধুয়া। ভিণ্ডি, বেগুন, মুলো, লঙ্কা, কুমড়ো। নানাবিধ সবজি। লছমনের বাগান থেকে চারা এনে, বীজ এনে বুধুয়া এই সবজির খেতটুকু করেছে। বউ তার ডবকা। বউয়ের খিদে বেশি।

বউ খুব ঝুঁকেছিল, সেও যাবে লছমনের খেতে কাজ করতে। তার পেট ভরতে চায় না। নিজের খাবার যোগাড় সে নিজেই করবে। বুধুয়া সব কথাই শুনেছিল। বলেছিল, ছেলেটা হয়ে যাক! তারপর যা চাস, করবার ব্যবস্থা করে দেব।

বড্ড খেটেছিল বুধুয়া। উঠোন ঘিরেছিল কাঁটাঝোপের বেড়ায়। উঠোন কোদাল কুপিয়েছিল। চুরি করে সার আনত লছমনের খেত থেকে। বাঁকে বয়ে জল আনত নদী থেকে তাতের সময়। কয়েক মাসেই সেজে উঠেছিল উঠোনটা। শনিচরী হেসে বলেছিল, এ খুব ভাল হল বুধুয়া। তোর বাপও এ রকম সব খেত করতে চেয়েছিল রে।

নাতি হল। নাতির দেড় মাস বয়স হতেই বউ জেদ ধরল সে খাটতে যাবে। বুধুয়া বলল, যাবি। হাটবারে সবজি বেচতে যাবি। মালিকের খেতে যেতে হবে না। মালিকের খেতে কাজ করলে যুবতী মেয়েরা ঘরে ফেরে না।

ইশ, কোথায় যায়?

প্রথম ভাল ঘরে, তারপর বাণ্ডীটোলিতে। এ নিয়ে আর কথা বললে মাথা নামিয়ে দেবে ধড় থেকে।

বউ হাটে গিয়েছিল।

শনিচরী বলেছিল, হাটে পাঠালি বুধুয়া? নয় ও ঘরে থাকত, আমি যেতাম।

না মা। তুই আর আমি খেতে খাটতাম, ও তো ঘরে থাকত। কোন দিন দেখেছিস ও রেঁধেবেড়ে রেখেছে, জল এনে রেখেছে, ঘরদোর ঝাড়ু দিয়েছে?

না।

শনিচরী আর বুধুয়া দুজনেই জেনেছিল, বউয়েব মন বসবে না রোগা বরে, দুঃখের সংসারে। শনিচরী বউকে বলেছিল, ও আর

কতদিন! চোখে মুখে কালি পড়েছে। যতদিন থাকে, একটু সমঝে চলিস।

বউ সে কথা অক্ষরে অক্ষরে মানে। বুধুয়া যতদিন থাকল, সেও ততদিন ছিল। ছেলের ছয় মাস বয়েস তখন। বুধুয়ার সেদিন, সেদিন কেন, কয়েকদিন ধরেই খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল। বৈদ্যের ওষুধেও কাজ হয়নি। শনিচরী বউকে বলেছিল বুধুয়ার কাছে থাকতে। নিজে গিয়েছিল, দৌড়ে দৌড়েই গিয়েছিল বৈদ্যের কাছে অন্য ওষুধ চাইতে। ওষুধে আর কাজ হবে না জেনেও ওষুধ আনতেই গিয়েছিল ও। বৈদ্যের বাড়ি মাইলখানেক দূরে। মাগো! ভাবলে কেমন লাগে, অতখানি পথ কেমন করে দৌড়েছিল ও? কিন্তু বৈদ্য ছিল না ঘরে, হাটে গিয়েছিল। ঘরে ফিরতেই শনিচরী, "ওষুধ দাও, ওষুধ দাও" — বলে মাথা কুটেছিল। বিরক্ত হয়ে বৈদ্য বলেছিল, ছোট জাতের ধৈর্য সহ্য থাকে না। ছেলের অবস্থা যদি অতই খারাপ হবে, বউ হাটের দিকে ছুটছে কেন? নিশ্চয় ভাল আছে তোর ছেলে।

ঘরে ফিরে শনিচরী বুধুয়াকে জীবিত দেখেনি, বউকে ঘরে দেখেনি। বাচ্চাটা তার ঘরে কাঁদছিল।

বউ আর ফেরেনি। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বুধুয়ার দাহের ব্যবস্থা করা, বউ পালাবার কেচ্ছা চাপা দিতে ছুটাছুটি করা, এই সব করতে গিয়ে বুধুয়ার জন্যেও কাঁদা হল না। কাঁদতে পারত না শনিচরী। কেমন যেন ধন্দ ধরে বসে থাকত। তারপর চোখ বুজে শুয়ে পড়ত।

গ্রামের মানুষ দেইজি-কেজেতে মেতে থাকে। বুধুয়ার মৃত্যুর পর সেই মানুষেরই আরেক রকম চেহারা দেখেছিল শনিচরী। বুধুয়ার ছেলে হরোয়াকে নিয়ে ও হিমশিম খেত। বুধুয়া যে নেই, তাও যেন ভুলে যেত শনিচরী। কবে যে বুধুয়া ছিল না তাই ওর মনে থাকত না। যখনকার কথা যতদিনের কথা মনে পড়ে, ততদিনই

বুধুয়া ছিল যেন ওর সঙ্গে। শনিচরী যখন মালিক মহাজনের খেতে কাজ করত, বুধুয়া ঘরদোর সাফ করে জল এনে রাখত নদী থেকে। খেত কুড়োনো মাটিমাখা গম বা ভুট্টা নদীর জলে ধুয়ে আনত। শান্ত, বুঝদার, দুঃখী মায়ের ছেলে। সব সময়ে থাকত বুধুয়া, কেমন করে শনিচরী মেনে নেবে, যে আর তাকে রাতে উঠে জল গরম করে খাওয়াতে হবে না বুধুয়াকে? স্বপ্নাদ্য মলম মাখাতে হবে না বুধুয়ার বুকে! বুধুয়ার ছেলেটা পড়ে পড়ে কাঁদত।

একদিন দুলনের বউ, ধাতুয়া লাটুয়ার মা, এ তল্লাটে বিখ্যাত ঝগড়ুটে মেয়েমানুষ, এসে দাঁড়াল। ছেলেটাকে তুলে নিল বুকে।

কি করিস! অ ধাতুয়ার মা!

হরোয়াকে নিয়ে যাই।

কেন?

ধাতুয়ার বউয়ের কোলে ছেলে। তার দুধ খাবে।

কেনে? আমার নাতি, আমি মানুষ করব।

সবাই সবাইয়ের ছেলে নাতিকে মানুষ করে, তুইও করবি। কিন্তু ধাতুয়ার বাপ বলল, কাজ ধরেছে একটা।

কোথায়?

গোরমেন রেললাইনে মেবামতি করবে। ঠিকাদারের কাছে ধাতুযার বাপ ফুরন নিয়েছে বিশটা মজুর দেবে।

তুই যাবি নাই?

গৈয়া গাভীন্ হায। তা ছাড়া মালিকের ঘরে পূজা। জঙ্গল সাফাই, রান্নার কাঠ চেলা করা— বেগারী কামও আছে।

দুলন গঞ্জু! বহোত্ শানদার খচড়া বুড্ঢা। কাজে মাতিয়ে আমাকে....

সে যা বুঝিস্।

ধাতুয়ার বউয়ের কাছে দুধ খেয়ে প্রাণে বাঁচল হরোয়া। যতদিন

ঠিকাদারী কাজ চলে, শনিচরীর ঘরে উনুন জ্বলেনি। শনিচরীর রুটি ও আচার দুলনের সঙ্গেই দিয়ে দিত দুলনের বউ। যত আটা খরচ হয়, সব পরে শোধ করে দেয় শনিচরী। কিন্তু সব ঋণ কি শোধ হয়?

দুলনরা দেখেছিল, পরভু গঞ্জু বলেছিল, একেবারে একলা হয়ে গেলে। সম্পর্কে জ্যেঠাইন্ হও, না হয় তোমার ঘরের দোর-জানালা-চালা এনে আমার উঠোনে ঘর তুলে দিই?

নাটুয়া দুসাদ শনিচরীর উঠোনের সবজি হাটে বেচে দিত। গ্রামের মানুষ সে সময়টা এইভাবে এসে না দাঁড়ালে শনিচরী কি বাঁচত? বুধুয়ার কসবী বউটার কথা কেউ বলত না। তবে শনিচরী জেনেছিল। হাটে যারা এক টাকায় চার রকম দাওয়াই বেচে, সেই সব দাওযাইওয়ালাদের একজনই বউকে বুঝিয়েছিল! বউকে গয়া— আরা ভাগলপুর দেখাব— নৌটঙ্কী সিনেমা সার্কাস দেখাবে— রোজ পুরীকচৌরি খাওযাবে। সে লোকের সঙ্গেই গেছে বউ।

ছেলেটাকে নিয়ে যায় নি কেন?

শনিচরীর মনে হত, ছোটবেলায় দেখা মোতির মায়ের কথা। মোতিকে নিতে চেয়েছিল মালিক, মোতির মা দেযনি। মোতি পালিয়ে যায় লাইনের কুলি যোগাবার ঠিকাদারের সঙ্গে। মোতির মা শনিচরী মায়ের জাঁতার গম ভাঙতে আসত আর বলত, মালিকের হাতে মেয়ে দিলে তবু দেখতে পেতাম মুখখানা।

শনিচরী তা বলে না। গেল যখন, ওইভাবে হারিয়ে গেছে। সেই ভাল নইলে মালিকের ঘরে সে থাকত রানী হয়ে। শনিচরী আর হরোয়া বাইরে গোলাম খাটত, সে ভারি অপমানের কথা হত। তাছাড়া, শনিচরী আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে জানে। বউও কাজ করলে গ্রামের লোক তাকে নামে না হলেও কাজে একঘরে করত। তেমন হলে গ্রামে থাকা চলবে না। নিরন্ন ও রাঁকা দরিদ্রের বড়

দরকার অন্য নিরন্ন রাঁকাদের মদত। সে মদত না থাকলে মালিকের পাঠানো দুধ ঘি খেয়েও গ্রামে বাস চলে না।

আস্তে আস্তে শনিচরী সহজ ও স্বাভাবিক হল। হরোয়াকে মানুষ করল, সাধ্যমত যত্নে। গ্রামের বুড়োবুড়ি, প্রবীণ ও প্রৌঢ়, সবাই হরোয়াকে বলত, বহোত্ দুখ্ কী তোহ্‌রা নানী। উস্‌কো দুখ্ মত্ দিয়া করো ও হরোয়া।

হরোয়া মাথা নিচু করে শুনে যেত। ওর বয়স বছর চোদ্দ হতে শনিচরী ওকে নিয়ে গিয়েছিল। রামাবতার সিংয়ের ছেলে লছমন সিং এখন মালিক মহাজন। হাজার। মালিক পরোয়ার। অন্য জমানা এখন। মালিকও নতুন জমানায় নতুন রকম। লছমন সিং খেতমজুর, ছোট জাত ও কিষাণদের শায়েস্তা করতে এখন মস্তান রাখে। ঘোড়াচড়া, বন্দুক চালানো মস্তান! রামাবতার লাথ মারত, নাগরা পেটাত। কিন্তু মন ভাল থাকলে ওদের সঙ্গে গল্পও করত। লছমন সিং বাপের ওসব আচবণকে মনে করে দুর্বলতা। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চলে ও।

শনিচরী তার কাছেই গিয়েছিল। বলেছিল, সবই তো জানো মালিক। শনিচরীর চেয়ে দুর্ভাগী জন্মায়নি কখনো। এই ছেলেটা আমার নাতি। একে একটা কাজকর্ম দাও। নইলে বাঁচব না।

লছমন সিংয়ের বোধহয় মনটা ভাল ছিল সে সময়ে। সে বলেছিল, হাটে আমার দোকানে মাল বইবে। ঝাড়ু পানি করবে। মাসে দু টাকা পাবে ঔর পেটখোরাকি।

হজৌর কা কিরপা।

শনিচরী নাতিকে নিয়ে উঠে এসেছিল। মোহনলালের কাছ থেকে ঠাকুরের প্রসাদ এনে মাদুলিতে ভরে, সে মাদুলি গলায় বেঁধে তবে হরোয়াকে পাঠিয়েছিল হাটে।

অনেক কথা বলেছিল।
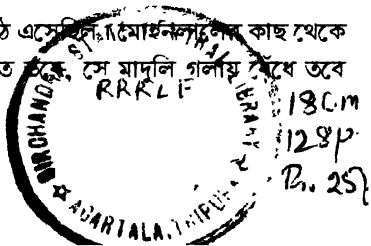
হাটে অনেকে গরু মোষ আনে। সেখানে যাস না হরোয়া। ভৈষা লাথ মারলে মরে যাবি।

নায় নানী।

কোনো মন্দ লোকের কথা শুনিস না।

নায় নানী।

প্রথম কয়েক মাস খুব মন দিয়ে কাজ করত হারোয়া। মাইনের টাকা দিত নানীকে। জলপানির ছাতু, গুড়, বয়ে বয়ে আনত। খেয়ে মেখে চেহারা ফিরেছিল ক্রমে। ক্রমে মন আন্‌চান্ হল! একবার টাকা দিল না, একটা রঙিন গেঞ্জি কিনল। আরেকবার কিনল একটা প্লাস্টিকের মাউথ অর্গান। সেবার খুব ধমক-ধামক করেছিল শনিচরী। তারপর স্বয়ং লছমন যখন বলল, হারোয়া দোকানে থাকে না, সর্বদা ম্যাজিওয়ালাদের পেছন পেছনে ঘোরে— তখন শনিচরী হরোয়াকে কসে মেরেছিল। বলেছিল, বেচাল করবি তো তোর পা কেটে দেব। ঘরে বসিয়ে খাওয়াব, তবু কুপথে যেতে দেব না।

আবার কিছুদিন মন দিয়ে কাজ করল হরোয়া। তারপর পালিয়ে গেল। নাটুয়া এসে বলল, ম্যাজিকওয়ালাদের সঙ্গে চলে গেছে হরোয়া।

যাক্ গে।

''যাক গে'' বললেও শনিচরী ঘরে বসে থাকে নি। হাট থেকে হাটে মেলা থেকে মেলায় খুব খুঁজেছিল। নাতির জন্যে কাঁদার কথা মনেই হয়নি ওর। এ রকমই যে হবে, তাই মনে হয়েছিল। সেই সময়ে হরোয়াকে ফিরে পাবার আশা যখন নেই আর মনে, হঠাৎ দেখা বিখ্‌নির সঙ্গে। বিখ্‌নি ওর ছোটোবেলার খেলুড়ী। কালো কম্বলের ঘাগরা পরত বলে সবাই বলত কালীকমলী বিখ্‌নি। একটা পোঁটলা কাঁধে হনহনিয়ে হাঁটছিল বিখ্‌নি। হাঁটতে হাঁটতে শনিচরীর গায়ে ঠেলা দেয় ও অসাবধানে।

কে রে তুই? চোখের মাথা খেয়েছিস?

চোখের মাথা তোর বাপ খেয়েছে।

কি বললি ?

ওইতো শুনলি।

চমৎকার একটা যুদ্ধ বাধছিল। শনিচরীর খুব ভাল লাগছিল। জমাটি ঝগড়া একখানা করলে মনের বহু জঞ্জাল কেটে যায়, সাফ হয়ে যায় সব।

ধাতুয়াব মা সেইজন্যেই কাকচিলের সঙ্গেও ঝগড়া করে। ঝগড়া করলে মন ভাল থাকে, শরীর ভাল থাকে, দেহের রক্ত বন্দুকেব গুলির মত দমাদম চলতে থাকে। কিন্তু দুজনে দুজনের দিকে চাইতেই বিখ্নি বলেছিল, এ কি! তুই শনিচবী না ?

তুই, তুই কে ?

বিখ্নি। কালীকমলী বিখ্নি।

বিখ্নি ?

হ্যাঁ রে!

তোর তো সেই লোহারডগাতে বিযে হযেছিল।

আজ কতকাল আছি জুজুভাতুতে।

জুজুভাতু ? আর আমি থাকি টাহাড়ে! এক বেলার পথ গো, তবু দেখা হয়নি কখনো!

চল, বসি কোথাও।

দুজনে একটা পিপল গাছের ছায়ায় বসল, দুজনেই দুজনকে আড়ে আড়ে দেখছিল। দুজনেই নিশ্চিন্ত হল, ওর অবস্থা আমার চেয়ে ভাল নয়। বিখ্নিরও হাতে-গলায়-কপালে-শনিচরীর মতই-গয়না বলতে উলকির দাগ। অভ্যাস বশে দুজনেরই কানের ছিদ্রে শোলা গোঁজা। শনিচরী ও বিখ্নি বিড়ি ধরাল। দুজনের চুলই রুক্ষ।

শনিচরী কি হাটে এসেছিলি ?

না রে। নাতিকে খুঁজতে এসেছিলাম।

শনিচরী অতি সংক্ষেপে হুরোয়ার কথা, নিজের কথা, সবই বলল। বিখ্নি সব শুনে বলল, দুনিয়া থেকে মমতা চলে গেল না কি? না, তোর-আমার কপাল দোষ?

শনিচরী অনেক দুঃখে হাসল। বলল, স্বামী নেই, ছেলে নেই, নাতিটা যেখানে থাক, প্রাণে বেঁচে থাকুক।

বিখ্নি বলল, তিন মেয়ের পর এক ছেলে। ছেলের বাপ মরেছে কবে, বিখ্নিই ছেলেকে মানুষ করেচে, পরের বাছুর পালানি নিয়ে ক্রমে ক্রমে চারটে গাই, দুটো দুধেলা ছাগল, স-ব করেছে। বিয়ে দিয়েছে ছেলেকে, আবার ছেলের গওনার সময় গ্রামকে দই-চিড়ে-গুড় খাইয়েছে মহাজনের কাছে ধার করে।

তারপর?

মহাজন এখন সেই ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি নিয়ে নিচ্ছে। ছেলে যাচ্ছে শ্বশুরাল।

''শ্বশুরাল'' বলে বিখ্নির থুথু ফেললে। বলল, শ্বশুরের ছেলে নেই। আর দুটো জামাইয়ের মত ছেলেও তার গোলাম হবে। বললাম, গরু বেচে ধার শোধ করি। ছেলে গাই-গরু নিযে শ্বশুরাল রেখে এসেছে। আমিও বিখ্নি. আমি ছাগল দুটো এই হাটে বেচলাম। ছেলে জানে না। বাস, ট্যাঁকে কুড়ি টাকা নিয়ে চললাম।

কোথায় যাবি?

কে জানে? তোর ছেলে নামে যশে নেই। আমার ছেলে থেকেও নেই। চলে যাব ডালটনগঞ্জ, কি বোখারো, কি গোমো? ভিক মাঙব টিশনে।

শনিচরী নিশ্বাস ফেলল। বলল, আমার সঙ্গে চল। দুখানা ঘর, যেন হা-হা করছে। ঘরে ঘরে শোবার মাচা। বুধুয়া করেছিল। আজও উঠোনে ভিণ্ডি-মিরচা-বাইগন হয়।

আমার টাকা ফুরোলে পরে?

তখন দেখা যাবে। তোর টাকা তোর থাকুক। শনিচরী এখনো আধপেটা কামাই করে।

তাই চল। হ্যাঁ রে, জলের সুখ আছে?

নদী। পঞ্চায়েতী কুয়োটার জল বড় তেতো।

একটু দাঁড়া।

আবার হাটে গেল বিখ্‌নি, ফিরে এল একটু বাদে। বলল, উকুন মারা ওষুধ কিনে নিলাম। মিট্টি কা তেলের সঙ্গে মাথায় ঘষে মাথা ধুয়ে ফেলব। যত মনের জ্বালা, তত কি উকুনের জ্বালা?

পথ চলতে চলতে বিখ্‌নি বলল, নাতনিটা হয়তো রাতে কাঁদবে। আমার কাছে ঘুমোত!

শনিচরী বলল, কয়েকদিন। তারপর ভুলে যাবে।

শনিচরীর ঘর দেখে বিখ্‌নি খুব খুশি। তখনি জল ছিটিয়ে ঘরদোর ঝাড়ু দিল। নদী দেখতে গেল, জল আনল এক গামলা। বলল, আজ রাতে উনোন জ্বালব না। রুটি আর আচার নিয়েই বেরিয়েছিলাম।

বিখ্‌নি ঘোর সংসারী। দু'দিনেই শনিচরীর ঘর ও উঠোন নিকোল ও। সোডা-সাবানে নিজেব আর শনিচরীর কাপড় কাচল। কাঁথা ও মাদুর রোদে দিল। নিজের সংসারেব দখল বউয়ের হাতে চলে যাচ্ছিল বলে ইদানীং ও কোন কাজকর্মে যেত না। সেটা অভিমানে, কিন্তু বউ বলত, ওর শাশুড়ী কামচোরা। সংসারের নেশা মানুষকে, বিখ্‌নির মত দুঃখী মানুষকেও অবাস্তব স্বপ্নাশ্রয়ী করতে পারে। এখানে কতদিন থাকবে ঠিক নেই, শনিচরীর সংসার- বিখ্‌নি একদিন কোদাল নিয়ে উঠোন কোপাতে শুরু করল। বলল, একটু খাটলে সবজি হবে খুব।

উকুনের ওষুধে শনিচরীর মাথা থেকেও শরণাগত জীবগুলি নির্বংশ হল। টানা ঘুমে রাত কাটিয়ে উঠে শনিচরী বুঝল, উকুনের

কামড়ে ঘুম হত না, মনের জ্বালায় নয়। মনে যত জ্বালা থাকুক, খাটাখাটুনির শরীরে ঘুম আসে।

বিখ্‌নির টাকায় দুজনে ক'দিন খেল। ওদের টাকাও ফুরাল, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল শনিচরীর। সেদিনই দুলনের ছোট একটা বাছুরকে নেকড়ে ধরে নিয়ে গেল। লাকড়া তাড়াবার উত্তেজনায় সবাই যখন মেতেছে, তখনি খবর এল স্থানীয় আরেক জোতদার ভৈরব সিংকে কে বা কারা যেন, একটি জমিতে কেটে রেখে গেছে। জমিটি গোটা দশেক দেওয়ানী মামলার জন্ম দিয়েছে। ভৈরবের মৃতদেহ ধারণ করে জমিটি ফৌজদারীতে প্রোমোশান পেল। গ্রামে সবাই জেনে যায়। সবাই জানল ভৈরবের বড় ছেলেই খুনটি করিয়েছে। বৈমাত্র্য ভাইদের প্রতি বাপের অত্যধিক স্নেহাধিক্য দেখে সে নিজের আখের বিষয়ে স্বাভাবিক কারণেই দুশ্চিন্তিত হয়েছিল। ভৈরবের বড় ছেলে পিতৃহত্যার দায়ে সৎ ভাইদের নামে মামলা আনবে বলে শাসাল। সৎ ভাইরা দাদার নামে মামলা করবে বলে লছমন সিংয়ের মদত চাইতে গেল। লছমন বলল, চল, আমি যাচ্ছি। জমিটিতে তারও সবিশেষ লোভ ছিল।

অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে লছমন অকুস্থলে দেখা দিল। ছেলেদের লজ্জা দিয়ে সে মর্মভেদী দুঃখে বলতে লাগল, হায় চাচা! রাজা তুমি, স্বঘরে, মরবে। আজ কেন তুমি মাটিতে পড়ে আছ? কিসের দুঃখ তোমার?

ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা কি মানুষ? কে মেরেছে তা দিয়ে কি হবে? চাচা যে মরে গেল সেটাই হল প্রধান ও শেষ কথা। হায় চাচা! তুমি থাকতে ছোট জাত কখনো মাথা তোলে নি। দুসাদ গঞ্জুর ছেলে তোমার ভয়ে পড়তে যায় নি সরকারি স্কুলে। আজ কে সে-সব দেখভাল করবে।

ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, এখন আসল কাজ চাচার সম্মান

রেখে সদগতি করা। ওঁকে ঘরে নাও, পুলিসকে খবর দাও। লেকিন সেখানে কোনো নাম উঠাবে না। লাশ তোহরি যাবে না, চেরাই ফাড়াই হবে না। যে ভাবে চাচা মরলেন, ও হো হো, বীরের মৃত্যু। কিন্তু যে ভাবে চাচা মরলেন, সে ভাবে তো তাঁর মরার কথা নয়? মানুষ অনেক কথা বলবে। তাই সদগতি ভ'ব কিরিয়া কাজ উচিত শোর মচাকে কর। চাচাকে বড় পালঙ্কে সাজিয়ে রাখো ঔর আমাদের রাজপুত সমাজকে খবর দাও।

তারপর ছেলেদের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে বলল, নিজেদের বিবাদ ভুলে যাও। আমার বাবা নেই। চাচা গেল তো ইন্দ্র পতন হল। আমাদের সমাজের সকলকে ডাকো। এখন নিজেদের বিবাদ উঠাবার সময় নয়। মখ্খন সিং, দৈত্তারি সিং, গোল পাকাবার মানুষ অনেক আছে।

লছমন সিং এই কাজে মেতে থাকল বলে শনিচরী তাকে ঘরে পেল না। ঘরে এসে গালে হাত দিয়ে বসল ও। তারপর বিখ্নিকে বলল, চল, দুলনের কাছে যাই। টেঁটিয়া বুড়া, বহোত কিরকিচা আদমি। কিন্তু দিমাগটা খুব সাফাই। ও ঠিক একটা পথ বাতলাবে।

সব শুনে মেলে দুলন বলল, কামাইয়ের পথ থাকতে উপোস করে মরে কে?

—কৈছন কমাই?

—বুধুয়ার মা! কামাইয়ের পথ কি থাকে? মালিক-মহাজনের থাকে, দুসাদ-গঞ্জুর থাকে? পথ তৈরি করে নিতে হয়। কত টাকা লিয়ে এসেছিল সহেলী?

—বিশ টাকা।

—বি-শ-টা-কা?

—হ্যাঁ! আঠারো টাকার খেয়েছি।

—আমি হলে এ টাকা হাতে থাকতে থাকতে স্বপ্নে মহাবীরজি পেতাম।

—কা বোলত্? হাঁ লালুয়াকে বাপ?

—কায়? হমানি কে বোল সমঝত্ নায়?

—কা বোলত্?

—টাকা হাতে থাকতে-থাকতে কুরুডা নদীর পাড় থেকে আমি একখানা ভাল পাথর আনতাম। তাতে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে বলতাম, স্বপ্নে মহাবীরজি পেয়েছি।

—আমি যে ছাই স্বপ্নই দেখি না।

—আরে মহাবীরজি পেয়ে গেলে দেওতার ল্যাজ ধরে স্বপ্ন আপসে আসত?

—হায় বাবা!

—তোকে সবাই চেনে। তোকে দিয়ে জুত হত না। তোর সহেলী নতুন মানুষ, ও বললে আমরা মেনে নিতাম। তারপর মহাবীরজি নিয়ে তোহ্রির হাটে বসতিস। প্রণামী মিলত।

—দেওতাকে নিয়ে খচড়াই? এমনিতেই মহাবীরজির চেলাদের জ্বালায় গাছে ফল থাকে না।

—খচড়াই মনে করলে খচড়াই। নইলে খচড়াই কিসের! তোর হল মহাপাপী মন। তাতেই ভাবছিস খচড়াই।

—কৈছন? আঁ লাটুয়াকে বাপ?

—কৈছন! বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—বল?

—লছমনের মা বুড়ির বাত রোগ আছে?

—জরুর।

—তিনি আমাকে দশ টাকা দিয়ে বললেন, চাস থেকে দৈবী তেল এনে দে। চাস ভি গেলাম না, ঘর তেকে তেল ভি দিয়ে

এলাম দু দিন বাদে, তব্‌ভি খচড়াই হল না, কেন কি আমার মনে কোন খচড়াই না হ্যায়। সে তেল মাখল কাল, আজই বুড়ি লোটা নিয়ে অড়র খেতে পায়খানা করতে গেল। মন চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা। দেখ, বুধুয়াকে মা, পেটের চেয়ে বড় ভগবান নেই। পেটের জন্যে সব কাজ করা যায়, রামজি মহারাজের বাত।

দুলনের বউ ওপাশ থেকে বলল, বুঢ়া যদি মালিকের খেত থেকে কুমড়ো ছিঁড়ে আনে, তখনো বলে, এ রামজি মহারাজের বাত।

বিখ্‌নি বলল, আমাদের বিপদ। তার আসান কিসে হবে? বুদ্ধি দাও একটা, আমরা দুই বুড়ি।

—বারোহি গ্রামের ভৈরব সিং মরেছে?

—হাঁ। ছেলে বাপকে মেরেছে।

—তাতে তোমাদের কি? টাকার ঘরে মা ছেলেকে মারে ছেলে মাকে মারে। যে মরবার সে মরেছে। আমাদের ঘরে মরলে আপনজন কাঁদে। ওদের নাতেদাররা সন্দুকের কুঞ্জি সরায়। কাঁদার কথা ভুলে যায়। যাক, আমাদের মালিক গিয়ে মাথা দিয়েছে। এখন ভৈরবের লাশ দাহ হবে। কাল দুপুরে লাশ বেরোবে। ওদেব চাই বোনেবালী রুদালী। দুটো রাণ্ডী এনেছে। মালিক মহাজন মরলে রাণ্ডী আসে কাঁদতে। রাণ্ডী দুটো হয়তো ভৈরবেরই ছিল কবে, এখন শুকনো কাক। তারা জুতের নয়। তোরা যা, কাঁদবি, লাশেব সঙ্গে যাবি। টাকা পাবি, চাল পাবি। কিরিয়া কাজের দিন কাপড় ঔর খাবার পাবি।

শনিচরীব ভেতবে যেন ভূমিকম্প হল। সে বলল, কাঁদব? আমি? তুই জানিস না? কান্না আসে না আমার চোখে? দু চোখ জ্বলে গেছে আমার?

দুলন নিস্পৃহ কঠিন গলায় বলল, বুধুয়াকে মা! যে কান্না তুই বুধুয়ার জন্যে কাঁদিস নি, তা কাঁদতে বলছি না তোকে। এ হল

রুজির কান্না। দেখবি, যেমন করে গম কাটিস—মাটি বয়ে নিস, তেমনি করে কাঁদতেও পারছিস।

—আমাদের নেবে কেন ?

—দুলন আছে কেন ? ভাল মত রুদালী না পেলে ভৈরবের মান থাকবে কেন ? মালিক-মহাজন লাশ হয়ে গেলেও তার সম্মান চাই। ভৈরবের বাপ রামাবতার, এরা যে রাণ্ডীদের রাখত তাদের দেখ্‌ভাল্ করত। সেই মমতায় রাণ্ডীরা এসে কেঁদে গিয়েছিল ওরা মরলে। ভৈরব দৈতারি মথ্‌খন, লছমন্ এদেরও রাণ্ডী আছে। কিন্তু খেতমজুর ঔর রাণ্ডী, সকলকে এরা পায়ের নিচে রাখে! তাতেই রুদালী জোটে না। খতরনাক খচড়াই সব! সবসে হারামি য়ো গম্ভীর সিং। রাণ্ডী রাখল, সে ঘরে মেয়ে হল। রাণ্ডী থাকতে মেয়েকে দুধে-ঘিয়ে রাখত। রাণ্ডী মরতে মেয়েকে বলল, তোকে পুষব না আর। রাণ্ডীর মেয়ে রাণ্ডী, কাজ করে খা গিযে।

—ছি ছি!

—সে মেয়ে তো তোহ্‌রিতে রাণ্ডী বাজারে পড়ে আছে। পাঁচ টাকার রাণ্ডী এখন পাঁচ পয়সার রাণ্ডী। ভাল কথা, বুধুয়ার বউও তো তোহ্‌রিতে। ওই এক হালত্।

—তার কথা কে শুনতে চায় ?

—দুলন বলল, কালো কাপড় পরবি।

—তাই তো পরি।

দুলনই ওদের নিয়ে গেল। যেতে-যেতে, বিখ্‌নি বলল, এ রকম কাজ মাঝেমধ্যে, তারপর মালিকের খেতী কাম জুটে তো ভাল, নয় পাথর ভাঙার কাজ—দুটো পেট চলে যাবে।

শনিচরী বলল, গাঁয়ে কথা হবে না ?

—হলে হবে।

ভৈরব সিংয়ের গোমস্তা বচ্চনলাল দুলনকে চিনত। লছমন ওকেই

শবযাত্রার আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থার ভার দিয়েছে। সব কিছু ইন্তেজাম করা চারটিখান কথা নয়। বচ্চনের নিজের সংসারে দুটো কোদাল, একটা আলনা আর পেতলের বাটলোই দরকার দুখানা। এগুলো কিরিয়া কাজের ফর্দে ঢোকাতে হবে, মহা দুশ্চিন্তা। শনিচরীদের দেখে ও পানি পেল। বলল, তিন টাকা করে পাবি।

দুলন বলল, মহারাজ মরে গেল, তার রুদালী তিন টাকা? পাঁচ টাকা হজৌর।

—কেন?

—যা কাঁদবে হজৌর শুনলে আপনি বখশিশ দেবেন। লছমনজি বলেছেন, দশ-বিশ যা লাগে, কাঁদবার লোক চাই। এ বাবদে দুশো টাকা মঞ্জুর আছে।

গোমস্তা নিশ্বাস ফেলল। দুলন কেমন করে সব খবর জানতে পারে কে জানে!

—পাঁচ টাকাই দেব। যা, বাইরে গিয়ে বোস।

—ঔর চাল ভি দেবেন এক পাই।

—গম দেব।

—চাল দেবেন হজৌর।

—দেব।

—এখন ওদের জলপানি দিন পেট ভরে। ভাল করে না খেলে কাঁদতে পারবে কেন!

—দুলন! কটা হারামি মরে তুই জন্মেছিলি তাই ভাবি। যা, বাইরে যা। জলপানি দিচ্ছি।

ভৈরব সিংয়ের বড় ভৈরবী বলে পাঠালেন, যারা রুদালী, তাদের পেট ভরে চিঁড়ে-গুড় দাও। প্রসাদের বাপ কোনো জিনিসের অভাব রেখে যান নি।

পেট ভরে চিঁড়ে-গুড় খেতে-খেতে শনিচরী বুঝল, কান্না বেচে

তাকে খেতে হবে বলেই চোখের জল তোলা ছিল।

রাণ্ডী দুজন প্রথমে এই দেহাতী বুড়িদের আমল দেয় নি। কিন্তু শনিচরী ও বিখ্‌নি এমন তারস্বরে কাঁদল, এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলল ভৈরব সিংয়ের গুণের কথা, যে বাজারী রাণ্ডীরা ঘোল খেয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে গেল শনিচরী ও বিখ্‌নি। কাঁদতে কাঁদতে ফিরল। এ দিনে নগদ বিদায় পাঁচ টাকা ও আড়াই সের চাল একেকজন। বচ্চন বলে দিল, কিরিয়ার দিন আবার আসবি।

কিরিয়ার দিন মিলল কাপড় ও খাবার। পুরি-কচৌরি-বেসনের লাড্ডু। শনিচরী ও বিখ্‌নি খাবার বেঁধে নিয়ে গেল বাড়ি। শনিচরী দুলনের বউকে কিছু দিয়েও এল। দুলন সব খবরাখবর নিল। বলল, বচ্চন হারামি এ বাবদ দুশো টাকা পেয়েছিল, কুড়ি টাকায় কাজ সারল।

—সে তো হবেই লাটুযাকে বাপ।

—তোর সহেলীকে বলে দে, হাটে যায়-আসে নিয়মিত। হাটে যাবে, সব দোকানই মালিক-মহাজনদের। দোকানে-দোকানে ঘুরলেই খবর পাওয়া যাবে মালিকদের ঘরে কার অসুখ, কে মরছে। নইলে খবর মিলবে না। এরপর যখন যাবি, সেখানে বলবি, আমিই ঔর-ঔর রুদালী এনে দেব।

—কৈছন?

—তোহ্‌রি যাবি। রাণ্ডী বাজার।

—হায় ভগবান!

—তোর সহেলী যাবে?

—বিখ্‌নি বলল, যাব।

দুলন বলল, এত রাণ্ডী কি ছিল? এইসব রাজপুত মালিক-মহাজন চারদিকে? তাতেই রাণ্ডীর ছড়াছড়ি।

দুলনের বউ বলল, রাণ্ডী চিরকাল আছে।

—না, চিরকাল এখানে ছিল না। যত মন্দ জিনিস সব ওরা এনেছে।

ওরাও চিরকাল আছে।

—না, আগে ছিল এ মুলুক, ছোটনাগপুরের রাজাদের এক শরিকের। তখন এখানে পাহাড় জঙ্গল, ঔর আদিবাসী লোকদের টোলি। তখন, সে অনেক অনেক আগে। তাই তহশীলে কোল লোকরা বলোয়া করে।

দুলন যে কাহিনীটি বলে, তা খুবই দ্যোতক এবং কেমন করে দুর্ধর্ষ রাজপুতরা এই আদিবাসী ও অন্ত্যজ অধ্যুষিত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে জমিদার থেকে শুরু করে জোতদার-মহাজন, মা᳝িক পরোয়ার হয়ে বসে, তা বোঝার পক্ষে খুবই সহায়ক। এই রাজপুতরা ছিল ছোটনাগপুরের রাজার শরিকের সেনাবাহিনীর লোক৭ শ' দুয়েক বছর আগে এদের নানাবিধ অত্যাচারে অতিষ্ঠ কোলরা বিদ্রোহ করে। কোল বিদ্রোহ দেখা দিতে না দিতেই রাজা দেন এদের লেলিয়ে। কোল বিদ্রোহ দমন করার পরেও এদের সামরিক জোশ কমে না। এরা মেরেই চলে নিরীহ কোলদের। জ্বালিয়ে চলে শান্ত গ্রামগুলি। হরদা এবং ডোনকা মুণ্ডা তখন আবার কাঁড়ে শান দিতে থাকে। আবার কোল বিদ্রোহ ঘটাব উপক্রম ঘটে। তখন রাজা এই রাজপুতদের নামিয়ে দেন বসতিবিরল টাহাড় অঞ্চলে। বলে দেন, মাথার ওপর তরোয়াল ঘুরিয়ে ছোঁড়। যতদূর গিয়ে তরোয়াল পড়ল, ততদূর পর্যন্ত জমির দখল নাও। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি তরোয়াল ছুঁড়ে চল। তোমরা সাত সর্দার, এইভাবে যত জমি পেলে, তত জমি নিজে চাষবাস কব।

তখনি রাজপুতরা নেমে পড়ে টাহাড়ে এবং সেই থেকে এখানে ওদের জোত। শতক থেকে শতকে এদের জোতজমা বেড়েছে বই কমেনি। এখন এরা জোতজমা বাড়ায় তবে তরোয়াল ছুঁড়ে নয়।

বন্দুকের গুলি মানুষের গায়ে ছুঁড়ে এবং জ্বলন্ত মশাল মানুষের বসতিতে ছুঁড়ে দিয়ে। এখন এ অঞ্চলে যারা আছে, তারা পরস্পরের সঙ্গে একদিন সম্পর্কিত ছিল, আজ সম্পর্কের সূত্র ক্ষীণ। তবে পদমর্যাদায় সবাই সমান হতে চায়।

জীর্ণ খাপরার চাল-শোভিত মলিন মেটে বাড়ির টোলিতে অন্ত্যজদের বাস। আদিবাসীদের বসতিও গরীব চেহারার। এর মাঝে-মাঝে মালিকদের বিশাল মকান। মালিকদের মধ্যে মামলা ও রেষারেষি থাকতে পারে কিন্তু মালিকশ্রেণী কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এক। লবণ, কেরোসিন, পোস্টকার্ড ছাড়া এদেব প্রায়ই কিছু কিনতে হয় না। হাতি, ঘোড়া, মহিষ বাথান, উপপত্নী, জারজ সন্তান, উপদংশ বা অন্য যৌন ব্যাধি—"বন্দুক যাব জমি তার" বিশ্বাস সকলেরই অল্পবিস্তব আছে। গৃহবিগ্রহ আছে অগুনতি। দেবতারা এদেব সমর্থক। এরা সকলেই গৃহবিগ্রহদেব নামে জমি দেবত্ত করে রেখেছে। আবার ব্যক্তি হিসেবে আলাদা বৈশিষ্ট্যও আছে। দৈতারি সিংয়েব পাযে ছয়টা আঙুল। বনোযারি সিংয়ের বউয়ের গয়লাদোষ। নাথুনি সিংযের বাড়িতে স্টাফ করা বাঘ।

এদের কথা মনে করিযে দিয়ে দুলন বলল, এদেব মান সম্মান রাখতে রুদালী ঔরত চাই। বাস্, লাইন ধরিয়ে দিলাম, এখন লড়ে যা।

শনিচবী ও বিখ্নি মাথা নাড়ল। ওদের জীবনে সহজে কিছু মেলে না। ভুট্টার ঘাটো ও নিমক যোগাড করতে জান নিকলে যায়। কি সন্তানজন্মে, কি স্বামীমরণে এরা মহাজনেব কাছে বাধা। স্বশ্রেণীর কাছে মান রাখবার জন্যে এরা মৃত্যু নিযে বর্বর খরচ করে। সে খরচের কিছুটা শনিচরীর ঘরেও আসুক।

শনিচরী ও বিখ্নি লড়ে গেল। সবই লড়াই এ জীবনে। বিখ্নি এ গ্রামেব মেযে নয়। কিন্তু আশ্চর্য সহজে ও গ্রামজীবনের একজন

হয়ে গেল। ফসল বোনা ও কাটার সময় পুরনো খেতমজুর খাটল লছমনের কাছে। অন্য সময়ে চলে গেল হাটে-বাজারে, বাস স্টপের দোকানে। ওই খবর আনলে কে মরছে মালিক বাড়িতে। কার শ্বাস উঠছে। তারপর দুজনে কালো থান কেচেকুচে নিল। সেই থান পরল। আঁচলে বেঁধে নিল আটা-ভাজা চুরন।

সেই চুরন খেতে-খেতে দুই বুড়ি হনহনিয়ে হাজির মালিক-বাড়ি। মালিকের গোমস্তার সঙ্গে কথা বলল শনিচরী। কথার বয়ানও বাঁধা—কান্না যা কাঁদব হজৌর, তাতে রামনাম শোনা যাবে না। পাঁচ টাকা করে নেব, ঔর চাল। কিরিয়াকাজের দিন খাবার নেব, কাপড় নেব। দর কষবেন না, দর কমবে না। আরো রুদালী চান তো এনে দেব।

গোমস্তাও মেনে নিল সব। না নিলে উপায় কি ? ভৈরব সিংয়ের শবযাত্রায় এদের দেখার পর সবাই এদেরই চায়। এরা পেশাদার। দুনিযাদারী এখন শৌখিনের নয়, পেশাদারের। খেতমজুরদের হিসেব নয়-ছয় করতে, চক্রবৃদ্ধি সুদের অঙ্ক বাড়াতে গোমস্তাদের দক্ষতা দশ টাকা মাস মাইনেতেই তাদের চাষ-গেরস্তী, হাল-বলদ, চাইলে একাধিক বউ। অনাত্মীয মৃতের জন্যে কাঁদাও পেশাদারী কারবার। এ কাববারে বড়-বড় শহরে পেশাদারী বেবুশ্যেরা লড়ে যায়। শনিচরী এ অঞ্চলে এ পেশায় এসেছে। জায়গাটি শহর নয়। তোহ্‌রিতে বেবুশ্যেও অগণন নয়। তাই শনিচরী যা বলবে, মানতে হবে।

শুধু কাঁদলে একরকম রেট।

কেঁদে লুটোলে পাঁচটাকা এক সিকে।

কেঁদে লুটিয়ে মাথা ঠুকলে পাঁচ টাকা দু সিকে।

কেঁদে বুক চাপড়ে শ্মশানে গিয়ে শ্মশানে লুটোপুটি খেলে ছয় টাকা দিতে হবে।

কিরিয়াতে কাপড় চাই। সে কাপড় কালো থান হলেই ভাল।

এ হল রেট। তারপর, রাজালোক তুমি চালের সঙ্গে ডাল-নিমক তেল দিলে না হয়! লক্ষ্মী বেঁধেছ ঘরে, ও চাল তেল তোমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু শনিচরী তোমার নামযশ গাইবে দিকে দিকে।

সুন্দর চলতে লাগল কারবার। ভৈরব সিংয়ের শবযাত্রায় যারা কেঁদেছিল, তাদের আনাটা যেন মানের লড়াই হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে লাল এবং সাউরাও ডাকতে লাগল শনিচরীকে। গোকুল লালার বাবা মরতে গোকুল বলেছিল, কিরিয়া অবধি রোজ আসবি যাবি শনিচরী।

রোজই গোকুল ও'দের ছাতু ও গুড় দিত। বলত, তোদের দিলে পুণ্য হবে।

গোকুল কাপড়ও দিয়েছিল ভাল। মালিক-মহাজনদের মত সবচেয়ে সস্তার জন্তা কাপড় খোঁজেনি। বিখনি সে কাপড় দুটো হাটে বেচে দেয়।

গোকুলের বাড়ি পাওনাথোওনার কথা শুনে দুলন বলল, এ বেশ ভাল কথা মনে হল। এরপর যেখানে যাবি, সেখানে কিরিয়া পর্যন্ত যাওয়া আসাটা রাখিস। রুদালী দেখলে তারাও কিছু না কিছু দেবে। এ সময়ে কেউ অত হিসাব কষে না।

—হ্যাঁ, তারাও দেবে।

শনিচরী অবজ্ঞা জানাতে তামাকের ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, নিজের বাপ ভাই মরলে চোখে জল পড়ে না, কিরিয়ার খরচের হিসাব কষে? গঙ্গাধর সিংয়ের মত লোক জেঠা মরতে মুর্দায় ঘিউ মাখাল না, দালদা মাখাল, তা জান?

—ওরা নিজেরা কাঁদলে তোদের কি হবে?

—একটু কাঁদতে ত পারে।

—যাক। কাজের কথা শোন্।

—বল।

বড়লোকের কাণ্ড। নাথুনি সিংয়ের মা কিন্তু মরছে। নাথুনির ঘর তো দূরে। নাথুনি বলেছে, তোদের শান্ত্রা লাগাতে।

— মরছে! মরে নি তো!

— আরে নাথুনির কথা শুনলে তবে বুঝবি এদের মনে কত পাপ থাকে।

নাথুনি সিংয়ের যত জমিজমা সবই তো ওর মায়ের দৌলতে। ওর মা কে, তা জানিস?

— না। তোমার মত এ তল্লাটের সকলের কুলুজি কুষ্টির খবর কে রাখে তাই বল?

— ওর মা হল পরাক্রম সিংয়ের একমাত্র বেটি। পরাক্রম সিংয়ের জুলুম ছিল কত! যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি খাজনাই জুলুম উঠিয়ে ওর প্রজা, বুড়ো হাঁথিরাম মাহাতোকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে, ঘোড়া ছুট করিয়ে পরাক্রম সিং হাঁথিরামকে মেরে ফেলি।

—আমিও শুনেছি।

—পরাক্রমের সব সম্পত্তি পায় নাথুনির মা। সেই মার দৌলতে ওর যত বোলবোলা আর গরম। সেই মা আজ কতদিন খোঁখীর ব্যামোতে ভুগছে। কাশলে তাজা খুন ওঠে। রোগ না কি খুব ছোঁয়াচে।

— না না, বুধুয়ার তো হয়েছিল।

—বুধুয়া ছিল ভাল লোক! নাথুনির মা নিশ্চয় মন্দ লোক?

—সে যাক্ গে। কি বলছিলে?

নাথুনি এমন যোগ্য ছেলে, যে মাকে উঠোনের ওপাশে একটা ঘর তুলে তাতে রেখে দিয়েছে। খাটিয়ার সঙ্গে একটা বামছাগল বেঁধে রেখে দিয়েছে, বাস্, ওতিতক্ ইলাজ। না হেকিমী না কবিরাজী বৈদ্য চিকিৎসা না ডাক্তারী সুঁই ইলাজ। এখনো বুড়ি বেঁচে। নাথুনি চন্দন কাঠ, শাল কাঠ আনাচ্ছে, খুব ধুম উঠাকে মাকে জ্বালাবে! মা মরলে কিরিয়াতে দানের কাপড় আসছে গাঁট-গাঁট। কিরিয়াতে

ব্রাহ্মণকে খাওয়াবে বলে ঘি- চিনি-ডাল-আটা এনে মৌজুদ করছে। বাসনও দেবে, বাসন আনাচ্ছে।

—হা ভগবান, এখনো তো মরেনি।

মা সারাদিন হেগে-মুতে পড়ে থাকে। বিকেলে একবার মোতি দুসাদিন সাফ করে দেয়। এখন দুসাদিন ছুঁলে মায়ের জাত যাচ্ছে না। একটা দাই ঠিক করেছে। সে রাত্রে বুড়ির ঘরে ঘুমোয়। মা বেঁচে আছে, তাকে বাঁচাতে একটা টাকা খরচ করবে না, কিন্তু মাকে দাহ করতে, মায়ের কিরিয়া করতে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করবে নাথুনি।

—তাই বলছে?

—খুব চিল্লাচ্ছে। তাই তো বলি ওদের উল্টা হিসাব। জিন্দা মানুষকে দেখবে না মরে গেলে ধুমধামে কিরিয়াকাজ করে মান উঠাবে। এই শীতে বুড়ির গা থেকে রেজাইটা টেনে নিয়ে কাঁথা দিয়েছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি মরলে নাথুনি বাঁচে। এদের বাড়ি নিয়মিত যাস কিরিয়া অবধি।

—যদি কিছু না দেয়?

—দেবে রে দেবে। না দিলে নাথুনি গোকুল লালার কাছে হেরে যাবে না? নিন্দে হবে ওর জাতভাইদের কাছে।

কথায় বলে, মাঘের শীত বাঘের গায়ে। মাঘের শীতে ঠাণ্ডা লেগে নাথুনির মা মরে যায়। কিরিয়া অবধি যায় আসে শনিচরী। নাথুনির তিন বউ। বড় বউ বিরস বদনে শনিচরীদের আটা ও গুড় দেয় রোজ। বলে, বুড়ো হয়ে মরেছে, তার কিরিয়াতে অত খরচ কেন?

নাথুনির মেজ বউ অত্যন্ত ধনী জোতদারের একমাত্র মেয়ে। ধনী জোতদারের একমাত্র মেয়েকে বাপ বিয়ে করেছিল বলে নাথুনি মাতৃধনে ধনী। সেও অনুরূপ বিয়ে করতে চেয়েছিল। কপাল মন্দ,

বড় বউ ও ছোট বউ একতমা নয়। একতমা একা মেজবউ। সে আবার স্বামীর ঘরকে গরীবের ঘর মনে করে ও সতীনদের বিষনজরে দেখে। বাগের কারণ হল বড় ও ছোট বউ ছেলের মা, সে মেয়ের মা। অতএব লোকচক্ষে হেয়। বড় বউয়ের কথা শুনে সে ধারাল হেসে বলে, কিরিযাতে তিরিশ হাজার টাকা কি একটা টাকা হল? শত বছর বাঁচুক আমার বাপ, কিন্তু তিনি মরলে দেখিয়ে দেব কিরিয়া কাকে বলে।

বড় বউ বলে, তা তো খরচ করতেই হবে। তোর পিসির নাপিত-দোষ হয়েছিল সে কলঙ্ক ঢাকতে হবে না?

—হাসালে দিদি! আমার পিসির নাপিতদোষ? আমার পিসের নাম যে গয়া শহরে সবাই জানে। তোমার বোন যে ভাশুরের ঘর করে বিধবা হয়ে, সে কথা তো বলছ না?

এই থেকে তুমুল কলহ বাধে কিন্তু মেজ বউ পুণ্যবতী। তার কথা ভগবান শোনেন এবং বসন্ত রোগে মরতে বসে মেজ বউয়ের বাপ। মেজ বউ শনিচরীকে ডেকে পাঠায। বলে, শনি মঙ্গলের মড়া দোসর খোঁজে এ কথা সত্যি! নইলে শাশুড়ি মরল, সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবার চেচক হল কেন? শোন্ শনিচরী, এই একটা টাকা বখশিশ।

—চেচক?

—হ্যাঁ রে।

শনিচরী খুবই ন্যাকা সাজে ও বলে, তবে যে শুনি আপনাদের, উঁচা জাতের চেচক হয় না? চেচক হয় শুধু নিচু জাতে? আমাদের ঘরে? সেইজন্যে তো আমরা গোরমেনের টিকা ভি নিই, ঔর দেওতার পূজাও লাগিয়ে দিই।

—গোরমেনের টিকা গোরক্ত।

এ কথা বলেই নাথুনির মেজ বউ টিকা প্রসঙ্গে ছেদ টানে ও

বলে, তুই তো তখন ছিলি? বড় বউয়ের সঙ্গে আমার গরম-গরম কথা হল? তা, যে কথা সে কাজ আমার। বাপ বিনে কেউ নেই আমার। এখানে বাস করি শত্রুপুরীতে। ছেলের মা যারা, তাদেরই আদর যত, আমি তো মেয়ের মা।

—আপনারও আদর আছে।

—সে কি আমার আদর? আমার বাপ মোহর সিংযের টাকার আদর। বাপ আমাকে দূরে বিয়ে দিতে চায়নি, তাতেই তো সতীনের ঘর করছি। নইলে চৌহান রাজপুত আমরা, এ ঘরে বিয়ে হয়?

—কপালে যা লেখা আছে।

—তাই সত্যি রে। শোন, আমি চললাম বাপের কাছে। তুই আর বিখ্নি তো যাবি, আরো বিশটা বাণ্ডী নিয়ে যেতে হবে। তাদের দেব একশো টাকা, ঔর চাল। তোদেব দুজনের পঞ্চাশ টাকা ঔর চাল। কিরিয়াতক্ ওখানেই থাকবি, খাবিদাবি, ঔর কিরিয়াতে কাপড়লত্তা নিয়ে তবে আসবি।

—হুজুরাইন, আপনার বাবা তো মরেন নি।

পচে গেছে গা, খুব জোযান দেহ, অত দুধ-ঘি খাওযা শরীর। অমন শরীর ছেড়ে প্রাণ বেরোতে চায়? আমার শাশুড়ি মরতে তোদের মোটা চাল, খেসারির ডাল দিয়েছিল।

—ঔর তেল, লবণ, মির্চা।

—কত দিয়েছিল তা আমি জানি না? আমার বড় সতীনের হাতটা যে কত বড়, সে কি আমার জানা নেই? আমি দেব চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু অর গুড়।

—হুজুরাইন গরিবের মা-বাপ।

—তবে হ্যাঁ, কান্নার মত কান্না হওয়া চাই।

—কাঁদব, ঔর মাটিতে লুটাব?

—মাটিতে লুটাবি?

—মাটিতে লুটাব, ঔর মাতাও ঠুকব।

—মাথাও ঠুকবি!

—কপাল কেটে যাবে?

কপাল কেটে যাবে।

—আরো পাঁচ পাঁচ তোদের দুজনের। টাকাটা কোনো ব্যাপার নয় শনিচরী। আমার বাপের দাহ ঔর কিরিয়া এমন হবে, যে গল্প রয়ে যাবে মুল্লুকে। দেখে আমার স্বামী আর সতীনরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে। আমি এক বাপের এক মেয়ে। বাপ যা রেখে যাচ্ছে, তার মান রেখে কিরিয়াদাহ করে দেখিয়ে দেব। রোজ রুপোর গেলাসে দুধ খেয়েছে, জওয়ানীতে রাণ্ডী রেখেছে, বুড়ো হলেও রাণ্ডী রেখেছে। বিলাইতি বিনে মদ খায় নি। আমাকে দুঃখ দেবে নতুন বউ, তাই মা মরে গেলে বিয়ে করেনি।

—কিছু টাকা দিন, বাজারী রাণ্ডী লোগ্‌কে আগাম দিতে হবে। ওরা কি কম খচড়াই'?

—নে।

সমগ্র ব্যাপারটি বহুমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মালিক-মহাজনের ঘরে মানুষ মরলে দাহ কিরিয়াতে যত খরচ হয়, তার মান নিমেষে উঠে যায়। রুদালীদের সম্মানও ওঠে। ফলে ববাদ্দের বাইরে যে খরচ হয়, তা তুলে নেয় মালিকরা দুসাদ, ধোবি, গঞ্জু, কোলদের ঘাড় ভেঙে। সর্ব অর্থেই মোহর সিংয়ের অন্ত্যেষ্টি গল্পকথা হয়ে দাঁড়ায় এবং খরচের সিংহভাগ নিয়ে যায় ব্রাহ্মণরা। নাথুনির বউ আর স্বামীগৃহে ফেরে না। শ্বশুরের সম্পত্তি যাতে নাথুনি না পায়, সেজন্যে মেয়েদের বিয়েতে অসাগর খরচ করতে থাকে। অবশ্য তা কয়েক বছর বাদে।

শনিচরী তার সৌভাগ্যের কথা দুলনকে বলল। দুলন ফচফচ করে বিশ্রী হেসে বলল, কলিযারিতে সবাই ইউনাইন করে! তা

রুদালী ওর রাণ্ডীদের নিয়ে তু ভি ইউনাইন বনা দে এক? তু বন যা পিসিডেন!

—হায় রাম!

—এখন বাজারিয়া রাণ্ডী খোঁজ গে!

—কৈছন?

বিখ্নি হুঁকো নামিয়ে বলল, এনে দেব রাণ্ডী। মালিক-মহাজন যত মেয়েকে নষ্ট করে তারা রাণ্ডী হয়।

—দূর, ওরা একটা আলাদা জাত।

— না, না। তুই জানিস না।

—তোহ্রিতে হাটবারে গেলে মেলাই রাণ্ডী।

দুলনের কি মনে পড়ল, বলল, আবে শনিচরী, নওয়াগড়ের গম্ভীর সিংকে জানিস?

—বাবা! তা জানব না? হাঁথি চড়ে সে দেওয়ালীর মেলায় ঘুরে? এই এত বড় নাক আর গলায় ঘ্যাগ।

—খুব খারাপ কাজ করল।

—নতুন কি কাজ করল?

—ওর তো বাঁধা রাণ্ডী মোতিয়া তাকে বউয়ের সম্মানে রেখেছিল। মোতিয়ার মেয়ে গুলবদনকে রুপার মল পরিয়ে কোলে নাচাত। মোতিয়া মরে যেতে গুলবদনকে শাদী দেবে বলেছিল। আজ দেখি সেই গুলবদন তোহ্রি যাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। বলল, জনম দিতে জানে, পালপোষ করতে শেখেনি। বের করে দিল আমাকে। আমি শুধালাম, কেন? ও বলল, বুড়ার ভাতিজা খুব নাখারা জুড়েছে কতদিন। বলতে গেলাম, তা আঁখ মোটা করে বলল, মা মরে গেছে তিন মাহিনা, তুই কেন ঘর জুড়ে বসে আছিস? ভাতিজা কি বলে শুনতে হলে শোন্, নয়তো চলে যা। রাণ্ডীর মেয়ে তোর ভাতের অভাব কি?

—বহোৎ হারামি তো?

দুলন গলা ঝেনে কাশল। বলল, আমার মনে দুখ উঠে গেল। গুলবদন বলল, ওর ভাতিজার কাছে থাকব, নিজের মেয়েকে এ কথা বলতে পারত? ঔর থাকি যদি, আমার সন্তান হবে না? তারাও একদিন লাথ খেয়ে বেরোবে ত? তাই হবে, বাজারে যাব।

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, অমন রূপ! ওকে কোনো শেঠ তুলে নিয়ে যাবে।

বিখ্নি বিজ্ঞের মত বলল, নিজের মাকে দেখেছে, ও কি আর বাঁধা রাখ্নি হবে?

বিখ্নি গেল তোহ্রি। ফিরে এসে বলল, বাপ রে, মাই রে! টাকা পাবে বলতে রাণ্ডীদের ভিড় জমে গেল।

—দেখলি ওদের?

—দেখলাম?

—কেমন দেখলি?

—চার আনার রাণ্ডী সব, বুড়ো হযে গেছে। কষ্ট খুব। তব্ভি সুর্মা পরে ডিবরি নিয়ে দাঁড়াতে হয়। বুড়ো মরেছে জানলেই চলে আসবে। ভাল কথা!

—কি?

—বুধুয়ার বউ, তোর বেটার বউকেও দেখলাম।

—তোহ্রিতে?

—হ্যাঁ। তোর চেয়েও বুড়ো হয়ে গেছে।

—থাক ওর কথা।

—ও নিজেই পরিচয় দিল। আজ দশ বছর ওখানে আছে। ছেলের কথা শুধাল।

—তুই কি বললি?

—কি বলব? কেন বলব? কথাই বলিনি।

—বেশ করেছিস।

ধুঁধুলের তরকারি আর আটার লিট্টি খেতে-খেতে শনিচরীর বউয়ের কথা মনে পড়ল। খিদেটা খুব বেশি ছিল। কোন্ বছর যায়? সে বছর লাইনে হাতির পাল উঠেছিল আর একটা দাঁড়ানো ইঞ্জিনও ফেলে দেয়। বুধুয়া মরার বছর। ওই টোকো আম গাছটা ছিল এতটুকুন, এখন ফল দিচ্ছে। দশ বছব তোহ্রিতে। ভাল হয়েছে হারোয়া ভেগে গেছে কোথা। মায়ের পরিণতি জেনে যায় নি।

—না না, তাই ফেলিস কখনো?

খাওয়ার পর দুজনেই তামাক খেল। শনিচরী বলল, ওর করম! বুধুয়া মরলেও আমি ওকে ফেলতাম না।

—খুব গরিব দেখলি?

—খুব।

শনিচরীর মুখে আর কথা যোগাল না।

তারপর মোহর সিং মরল।

বিশাল ধুমধামে কিরিয়া হল। রাণ্ডী রুডিরা শনিচরী আর বিখ্নিকেই নমস্কার করে বলল, হুজুরাইন! আবার দরকার হলে পাত্তা চালিয়ে দিও। এসে যাব।

শনিচরী আর বিখ্নি কাপড়ের সঙ্গে ফনফনে পেতলের সরা আর বাঁশের ছাতাও পেয়েছিল। বিখ্নি সেগুলো হাটে বেচে দেয়। টাকা হাতে থাকতে-থাকতেই পোকা-কাটা ভুট্টা কেনে বোরা বোঝাই। বলে, জাঁতায় পিষলে আটা হবে, ভাঙলে দালিয়া হবে, বুঝলি?

ক্রমে জীবনটায় শৃঙ্খলা আসে। কেউ মরলে বাঁধা রোজগার। নইলে বাকি সময় আধাপেটা সিকিপেটা খাও। না জুটলে? কোই পরোয়া নেহী। বছরে একটা-দুটোর বেশি কাঁদার বরাত জোটে না। কাজেই সকলের মত জুটলে খেতমজুর খাট, নয়তো মালিকের খেত মুড়োও, জঙ্গলে গিয়ে মূল-কন্দ খোঁজ, সকলের মত।

বিখ্‌নিই সকলকে অবাক করে দিল। ছেলেকে দেখতে গেল না একবার, শনিচরীর উঠোনে লঙ্কা গাছ আব্‌জে লঙ্কা বেচল হাটে। তারপর বলল, রসুন বুনে দেখতে হবে। রসুন বিকোয় ভাল।

ক্রমেই ওদের সুনাম বাড়ল। শনিচ্চরীদের সবাই ডাকতে থাকল। হ্যাঁ, পযসা নেয। কিন্তু সত্যিই মাথা ঠোকে, সত্যিই গড়াগড়ি খায় মাটিতে। আর মৃতের যশোগাথা যে কতরকমে গেয়ে কাঁদে। শুনলে মৃতের আপনজনদের মনে হতে থাকে যে মরেছে, সে হাড়-বজ্জাত, শয়তানেব দোসব নয। সে স্বর্গের দেবতা, ছলতে ধরাধামে জন্মেছিল।

চমৎকাব চলছিল সব। দু বছর খুবই মন্দ যায়। নাথুনির বড় বউয়ের ভাই শোথজ্বরে মরতে বসেছিল, হাসপাতালে গিযে সেরে আসে। শনিচরীদের প্রত্যক্ষ মহাজন লছমনেব বিমাতার আচরণ আবো মর্মান্তিক। বাতজ্বরে নিশ্চিত ছিল মৃত্যু, কিন্তু, কোত্থেকে এক সর্বনেশে বৈদ্য এসে তাকে বাঁচিয়ে তুলল।

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, নসিব!

নাপিত পারশনাথও খুব অসন্তুষ্ট হল। বলল, য়ে ধবম কী বাত না হ্যায়।

—কৈছন?

—দেখ্‌ না তু, বুধুয়াকে মা! আগে আগে মানুষের রোগভোগ হলে মানুষ মরত। জনম কে সাথ্‌ সাথ্‌ মরণ ভি চলনা চাহিযে। নইলে ধরতির কাম চলে? অসুখ হলে বুড়ো মানুষ মরবে! তা না, ডাক্তার-বৈদ্য হেকিম, সবাই বুড়োগুলোকে বাঁচিয়ে তুলছে? এ তো ঠিক কাজ নয় বুধুয়াকে মা!

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, তোমার কি বল? জন্মে-বিয়েতে-মরণে তুমি আছ। বিয়ের কথা পাড়তেও তোমাকে লাগে। কিন্তু আমার কি অবস্থা হল তা বল?

বিখনি কিন্তু হতাশ হল না। বলল, সময় হয়নি তাতেই মরল না। সময় হলে কি কেউ থাকবে ?

দুলন বলল, এ কিছু নয় রে। আগের চেয়ে আজকাল বেশি খাস, তাতেই একটু এদিক ওদিক হতে চিন্তা হচ্ছে। মালিক-মহাজনকে দেখিস না ? লছমন সিংয়ের সৎ মা তো গম বেচা টাকা দেখলে কাঁদতে বসত। এ বছর গম হয়েছে, বেচে টাকা পেলাম। আগামী সনে যদি তেমন গম না হয় ?

শনিচরী বলল, যাও, সব কথায় কি তামাশা চলে ?

তারপর শনিচরীর কপাল খুলল, এই বছর। বিখনি হাসতে হাসতে এসে বলল, খুব ভাল খবর।

—কি ?

—সে বসে বলতে হবে।

—খবরটা কি ?

—রাগ করছিস ?

—কি খবর তা বলবি তো ?

—গম্ভীর সিং তো মরছে।

—কে বলল ?

বিখনি সব খুলে বলল। খবরটা দিয়েছে পারশ নাউ। নাপিতের দেওয়া খবর মিছে হয় না। নাথুনির মায়ের খোঁখীর ব্যামো হয়েছিল, শনিচরীর মনে আছে নিশ্চয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে খুব। বলুক না বিখনি।

নাথুনি তার মাকে যেভাবে রেখেছিল, সে নিয়ম এখন ঘরে ঘরে চলছে। খোঁখী মানে রাজযক্ষ্মা। শিবের অসাধ্য রোগ। এ রোগ যাকে ধরেছে, তাকে চিকিৎসা করালে স্বয়ং শিবঠাকুরকে অপমান করা হয়। গম্ভীর সিংয়ের আপন বলতে কেউ নেই। ভাতিজা সব পারে। সুতরাং খোঁখী রোগ হতেই ভাতিজা তাঁতপাতি উঠানে ঘর

তুলেছে। গম্ভীর সিংকে সেখানে রেখেছে। রামছাগল এনে ঘরে বেঁধেছে। রামছাগল দেখে গম্ভীর সিং বলেছে, ঘরে বত্তু বাঁধলে তো কেউ বাঁচে না। আমি কি বাঁচব না? না বাঁচলে এমন কিরিয়া করবি, যে দেখে সবাই তাজ্জব বনে যায়। সবাই শোচে যে হ্যাঁ, মানুষ একটা মরেছে বটে।

—তারপর কি হল? বিখ্নি বলুক?

গম্ভীর সিং খুবই আজীব লোক। এখন সে ওষুধবিষুধ ছেড়ে রোজ পুজো হোম যজ্ঞ করাচ্ছে। ওর বউ জেদ করে ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তারও ভরসা দিচ্ছে না।

—মরেনি তো এখনো?

—মরবে তো। ভাতিজার করাব নেই কিছু। বুড়ো ভকিলকে ডেকে কিরিয়া কাজে লাখ টাকা খরচ করতে বলেছে।

—কেন?

—বলছে টাকা সব ফুরিয়ে রেখে যাব। ভাতিজা জোতজমা চায করিয়ে যা পারে করুক। আমার ছেলেপিলে নেই। ওই বজ্জাতের জন্যে নগদ টাকা রেখে যাব না।

—তা হলে?

—আজ না হোক কাল, বুড়ো মরবে।

—ততদিন?

—আমি একবার ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবি?

—রাঁচি।

—রাঁচি? কেন?

—আর বলিস কেন? হাটে আমার দেওরপোর সঙ্গে দেখা। সে বলে, চাচী, একবার চল। তার মেয়ের বিয়ে।

—মেয়ের বিয়ে?

বিখ্‌নি নিশ্বাস ফেলে বলল, বলছে সে বিয়েতে নাকি সে হতভাগাও আসবে। আমার ছেলেটা। তুই বলবি,ছেলেকে দেখতে চাস তো ঘরের কাছে তার শ্বশুরালে যা? সে আমি যাব না। কিন্তু দেওরপোর বাড়ি গিয়ে একবার দেখে এলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। সেও জানবে না যে তাকে দেখতে এসেছি।

শনিচরী বলল, এ কথা বললে আমি বলব না কিছু। ছেলেকে দেখবি বলছিস। তবে ঝটপট আসবি তো? না, থেকে যাবি সেখানে?

—তা থাকি কখনো? ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, পথে তোর সঙ্গে দেখা। সেদিন তুই না থাকলে আমি কি করতাম?

—গম্ভীর সিংয়ের কথাটা মনে রাখিস।

—আরে আমি চারদিনের মাথায় ফিরব।

মাইল তিনেক হেঁটে গেলে বাস রাস্তা। শনিচরী ততখানি পথ গিয়ে বিখ্‌নিকে তুলে দিল বাসে। বলল, সিটে বসলে আট টাকা। মেঝেতে বসে চলে যা, দুটো টাকা দিস।

গ্রামে ফেরার পথে শনিচরী বুঝল, এ রকম উত্তেজনার ঘটনা তার জীবনে আর ঘটেনি। তাবই সহেলী বিখ্‌নি, যে হাঁটা পথ ছাড়া অন্য পথ জানে না, সে বাসে চেপে রাঁচি চলে গেল? দেওরপোর মেয়ের বিয়ে দেখবে বলে? মানুষের দেওরপো থাকে কাছেভিতে। রাঁচির মত বড় শহরে থাকে?

শনিচরী সকলের গল্প করতে করতে এল। সবাই বলল, শনিচরীর জীবনে সবটাই হল নিদারুণ দুঃখ। তবে বিখ্‌নিকে পাওয়া একটা আশীর্বাদ ওর পক্ষে। কি খাটিয়ে পিটিয়ে বুড়ি! শনিচরীর ঘরের চেহারাই ফিরে গেছে এখন। একেই বলে নিয়তির খেলা। কোথায় বাড়ি, কোথাকার কে সেই হল আপনজন। যেন কোন গাছের বাকল কোন গাছে জোড়া লাগল।

ঘরে ফিরে শনিচরীর যেন মন বসে না আর। অবশেষে ও গেল জঙ্গলে জ্বালানি কুড়োতে। শুকনো ডালপালা বয়ে নিয়ে এল খানিক। বিখ্নি কখনো খালি হাতে ফেরে না। নয় দুটো শুকনো ডাল, নয় একটা পথে পড়ে থাকা দড়ি, নয় এক তাল গোবর, যা হয় কিছু একটা ঘরে ঢোকে। এখন ওর মাথায় ঢুকেছে, কারো একটা বকনা বাছুর পেলে পালানি নেবে। শনিচরী ভেবে পায় না, এই বুড়ো বয়সে সংসারে এত মায়া কেন ওর!

কয়েকদিন এইভাবে গেল। গম্ভীর সিংয়ের অবস্থা প্রত্যাশিতভাবে মন্দ হতে থাকল। সেখানে গেল শনিচরী একদিন। গোমস্তার সঙ্গে সব কথাবার্তা বলে নিল। কথায় বার্তায় এখন জানা গেল, বলা হচ্ছে খোঁখীর ব্যামো। কিন্তু গম্ভীর সিং মরছে অন্য রোগে। অসুমার নারী সঙ্গ করবার ফলে দেহে ঘৃণ্য রোগ। শরীর গলে পচে যাচ্ছে। সেই জন্যেই এত যাগযজ্ঞের ঘটাপটা। রোগের জ্বালাতেই ওষুধ-বিষুধ না খেয়ে গম্ভীর সিং মরণকে কাছে ডাকছে।

—শুক্লপক্ষে মরতে চায়। —গোমস্তা বলল।

—কৈছন? —শনিচরীও তাজ্জব। মালিক-মহাজন সব পারে, তা বলে ইচ্ছে হলে শুক্লপক্ষেই মরতে পারে?

—কে জানে? —গোমস্তা দার্শনিক নির্লিপ্ততায় বলল, শুক্লপক্ষে মরলে সিধে বৈকুণ্ঠে। কৃষ্ণপক্ষে মরলে যুধিষ্ঠিরের মত প্রথমে নরকদর্শন, তারপরে স্বর্গবাস।

পুরাণের চরিত্রগুলি সম্পর্কে শনিচরীর বিশেষ গভীর জ্ঞান নেই। তবু তাদের মহত্ব বিষয়ে তার আনুগত্য আছে। ক্যালেন্ডারে যুধিষ্ঠিরের ছবি দেখার ফলে তার মনে ত্রিলোক কাপুর ও যুধিষ্ঠির, অভি ভট্টাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি একাকার। শনিচরী তাই অবাক হয়ে বলে, কৈছন? হাঁ হুজুর, মালিক-পরোয়ার কা যুধিষ্ঠির হ্যায়?

গোমস্তা এই অজ্ঞ স্ত্রীলোককে শান্ত কণ্ঠে বুঝিয়ে দেয়।

মালিক-মহাজন যা বলে, তাই হয়। পাপ এবং পুণ্য হল দেখার ভুল। দুষ্ট লোক বলবে, যে মালিক-পরোয়ার, বাপ বেঁচে থাকতে ডাকাতি করেছে অংরেজ আমলে, স্বাধীন ভারতে একাধিক লাশ স্বহস্তে ফেলেছে, লছমনের বাপের ঘোড়া চুরি করেছে, দুসাদটোলি স্বহস্তে জ্বালিয়েছে, যে মেয়েছেলেদেব বহুজনকে নষ্ট করেছে, সে মহাপাপী। মালিক নিজে তা মনে করে না। তাই কি পাপে তার মহাব্যাধি হল, তা জানার জন্যে বাড়িতে জ্যোতিষী-গণকের মেলা বসেছে।

—কুছ্ পাত্তা মিলা ?

—কা পাত্তা ?

—য়ো পাপ কা ?

—জরুর। গাভীন একটি গরুকে বালককালে মালিক ঠ্যাঙা ছুড়ে মেরে ফেলেছিল। এই একমাত্র পাপ।

তবুও বলি, ইচ্ছে হলেই মালিক শুক্লপক্ষে মরবে ?

—নিশ্চয়। এখন অবধি দেখলাম না, মালিক যা চেয়েছে তা হয়নি। তবে এও বলে দিচ্ছি, মালিক যা করছে, তা খুব ভাল করছে। ওই ভাতিজার হাতে পড়লে সম্পত্তি উঠে যাবে লাটে।

—কেন ?

—মালিক যা করেছে, অছুত হলেও সব হিন্দু ঘরে। কোন মেয়েটা অহিন্দু নয়। ভাতিজার রাণ্ডী তো মুসলমান।

—হায় রাম !

—তৈরী থাকিস বাপু। অ্যাদ্দিন চাকরি করলাম। কিরিয়া হয়ে গেলে আর এখানে থাকছি না। কিরিয়াও হবে, আমিও চলে যাব। মালিক বলেছেন, মোহর সিংয়ের দাহ্ ঔর কিরিয়া যেন মানুষ ভুলে না যায়, এমন ব্যাপার করতে হবে।

—জান লড়িয়ে দেব হুজুর।

শনিচরী ফিরে এল।

বাড়ি ফিরল দুর্ভাবনা নিয়ে, দিনে দিনে ছয়দিন হল। বিখ্‌নির ব্যাপার কি? গ্রামটাও ওদের অজগ্রাম। বাইরের জগতের সঙ্গে কাজ কারবার নেই মোটে। বাসে চড়ে কেউ কোথাও যায় না। রাঁচি থেকে বিখ্‌নির খবর কে এনে দেবে? নিশ্বাস ফেলে শনিচরী কাঁথা বিছানা রোদে দিল। চারটি ভুট্টা জাঁতায় ভাঙল। তারপর গেল পঞ্চায়েতী চালাঘর মেরামত করতে। এ কাজে মেহনত দেওয়া বাধ্যতামূলক। সর্বদা দেখাশোনা না করলে মাটির ঘর দিমাগ্ লেগে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। সে কাজ সেবে চারটি ডালপালা মাথায় বয়ে ঘরে এসে বোঝা নামিয়ে তবে ও লোকটাকে দেখল।

অচেনা লোক। মাথা নেড়া, খালি পা।

—বিখ্‌নি মরে গেছে?

শনিচরী যেন নিমেষে বুঝল সব, আব প্রশ্ন করল। বলল, তুমি তার দেওরপো?

—জী?

শনিচরীর ভেতরে তখনি ধস নামল। কিন্তু বহু মৃত্যু, বহু বঞ্চনা, বহু অবিচারে গঠিত ওর ধৈর্য ও সংযম। ও আগন্তুককে বসতে বলল। নিজেও বসল, চুপ করে রইল বহুক্ষণ। তারপর আস্তে বলল, কতদিন হল?

—চারদিন।

শনিচরী আঙুলে গুনে দেখে বলল, সেদিন আমি গম্ভীর সিংয়ের বাড়িতে। কি হয়েছিল?

—হাঁপানি থেকে বুকে কফ বসে গেল।

—এখান থেকে যেতে না যেতেই?

—পথে ঠাণ্ডাই শরবত খেয়েছিল।

—তারপর?

মনে পড়ছে রঙিন শরবত, হজমি গুলি, বেলের মোরব্বা, এ সব কিনে খাবার দিকে বিখ্‌নির বড় লোভ ছিল।

—তারপর হাঁপানি উঠে গেল। আমার শালা হাসপাতালের কাজ করে। ডাক্তার দেখালাম, সুঁই ইলাজ করালাম।

—আমি কোনদিন তা করিনি।

বেনেতে দোকানে ঝাঁটা চালিয়ে জখম করে আরশোলা ধরত শনিচরী। মেটে হাঁড়িতে আরশোলা সিদ্ধ করে জলটা খেতে দিত। বিখ্‌নির হাঁপেব টান কমে যেত।

—ওর ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—সে আর এল কোথায়? এখন তাকেও খবর দিয়ে যাব। জেঠাইন কি আপনার কাছে কিছু রেখে গিয়েছিল?

—কিছু না। জেঠাইন বলছ, মরল ও তোমার কাছে, তার কেউ আছে বলেই তো জানি না। পথে পথে ঘুরছিল....

—আমিও জানি না। জানলে নিয়ে যেতাম।

—এখন এস বাছা। বাসে যাবে, বাস রাস্তাও দূরে।

—লোকটি চলে গেল। শনিচরী এখন একা বসে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করল। কি হচ্ছে মনে? দুঃখ? না, দুঃখ নয় ভয়। স্বামী মরেছে, ছেলে মরেছে, নাতি চলে গেছে, বউ পালিয়েছে, দুঃখ শনিচবীর জীবনে কবে ছিল না? তখন এমন আগ্রাসী ভয় হয়নি ত? বিখ্‌নি মবে যেতে ওর পেশায় চোট পড়ল, ভাতে হাত পড়ল, তাতেই ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে কেন? বয়স হয়ে গেছে বলে। শনিচরীদের জীবন, পারলে শেষ নিশ্বাস অবধি খেটে চলার জীবন। বয়স মানে জরা। জরা মানে কাজ করতে না পারা। কাজ করতে না পারা মানে মৃত্যু। শনিচরীর নিজের মাসি বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। এত বুড়ো, যে পোঁটলার মত তাকে তুলে ঘরে নিতে হত। শীতের দিনে রোদ পোহাতে তাকে বাইরে বসিয়ে সবাই কাজে গিয়েছিল। এসে দেখে বুড়ি মরে কাঠ হয়ে আছে।

শনিচরী তেমন মৃত্যু চায় না। মরবে কেন? স্বামী মরল, ছেলে মরল, শনিচরী কি দুঃখে মরেছিল? দুঃখে মানুষ মরে না। প্রচণ্ড শোকের পরও মানুষ ক্রমে স্নান করে, খায়। লঙ্কা চারা খাচ্ছে দেখলে ছাগল তাড়ায়। মানুষ সব করে। কিন্তু না খেতে পেলে মানুষ মরে যায়। শনিচরী এত শোকে যখন মরেনি, বিখনির শোকে মরবে না। দুঃখ আছে খুব, কিন্তু কাঁদবে না শনিচরী। পয়সা, চাল, নতুন কাপড় না পেলে কাঁদাটা বাজে বিলাসিতা।

শনিচরী দুলনের বাড়ি গেল।

দুলন ব্যাপারটির সম্যক গুরুত্ব বুঝল। বলল, দেখ বুধুয়াকে মা। জমির দখল ছাড়তে নেই, তা তোহার লিয়ে য়ো রোনা-কাম জমিন হ্যায়। দখল ছাড়া চলবে না। তুই মজাটা দেখছিস না? একেক জন মরছে, তোরা যাচ্ছিস, ওরা কান্নাকাটির জাঁকজমক নিয়ে মানের লড়াই লড়িয়ে দিয়েছে। গম্ভীর সিংকেই দেখ না। ওর যে রোগ হয়েছে, তাতে ডাক্তারি ইলাজ করলে মানুষ সারে। ও সে চেষ্টাই করছে না। মরলে জাঁকজমকের কথা ভাবছে।

—ওদের কিসে মান, কিসে লড়াই, ওরাই জানে।

—তোকেও জানতে হবে।

—জেনে কি করব?

—বুধুয়ার বাপ মরতে তার মজুরি কাজ করিস নি মালিকের খেতখামারে?

—জরুর।

—বিখ্নি মরতে তার কামও করবি।

—কৈছন?

—নিজে যাবি। দুলন রেগে চেঁচিয়ে বলল, তোর রুটির ব্যাপার। নিজে যাবি।

—তোহরি?

—হ্যাঁ, তোহ্‌রি। যাবি, রাণ্ডী যোগাড় করবি। নইলে গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজা আর গোমস্তা সব টাকা মেরে দেবে।

—আমি যাব!

—জরুর।

—সেখানে যে....

—বুধুয়ার বউ আছে এই তো?

—তুমি জান?

—জরুর। তো কা, য়ো ভি এক বরবাদী রাণ্ডী হ্যায় না? ওকেও ডাকবি।

—ওকেও?

—জরুর। ওরও খেতে পরতে হয় না? রাণ্ডী ডেকে কাঁদানো এক মজার খেলা। মালিক মহাজনের টাকা পাপের টাকা। তার রয় ক্ষয় নেই। পাক না চারটি বাজারিয়া রাণ্ডীরা। তাদেরও ত মালিক মহাজন রাণ্ডী বানিয়ে কতজনাকে লাথ মারে, মারে না?

—মারে।

কে কেমন রাণ্ডী হয়েছে সব কথা শনিচরী জানে না। কিন্তু মনে পড়ল পেটের জ্বালায় বুধুয়াব বউ ঘর ছেড়েছিল, গুলবদন গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজাকে ভাই মনে করেছিল। কিন্তু গম্ভীর সিং বা ভাতিজা ওকে রাণ্ডী ছাড়া কিছু ভাবে নি। সব যেন বড্ড গোলমেলে। শনিচরী সব ভেবে দিশা করতে পারে না। কিন্তু দুলন কি বলছে?

অত পাপ পুণ্য দেখতে যাস না বুধুয়ার মা। পাপ-পুণ্য মালিকদের এক্তিয়ারের জিনিস। ওরাই সে হিসেব ভাল বোঝে। তুই আমি বুঝি খিদের হিসাব।

—সাচ বাত।

—তবে আর কি, চলে যা।

—গ্রামে সবাই মন্দ বলবে না আমাকে?

দুলন অতি দুঃখে হাসল। বলল, পেটের জন্যে কোন কাজ করলে, তাতে বুরাই দেকে কে?

শনিচরী ওর কথা বুঝল।

গম্ভীর সিং মারা গেল দিন সতেরো বাদে। ওর শ্বাস উঠেছে যখন, তখনি গোমস্তা শনিচরীকে খবর পাঠায়। শনিচরী বলে পাঠাল, আমি যাব, লোক নিয়ে যাচ্ছি।

শনিচরী কালো থানটা পরে নিল, চলে গেল তোহরি। লোককে জিগ্যেস করে রাণ্ডী পট্টির সন্ধান নিতে একটুও লজ্জা হল না ওর। পেটের হিসাব সবচেয়ে বড় হিসাব। ডাকতে ডাকতে ঢুকল ও, রূপা, বুধনি, সোমরি, গাঙ্গু! কাঁহা হ্যায় তু সব? আয় আয়, রুদালী কাম আছে।

চেনা-চেনা বেশ্যারা সব একে একে এল। ভিড় জমে গেল সেখানে। অনেক মানুষ। দিন পাঁচ টাকার বেশ্যা থেকে দিন এক সিকের বেশ্যা।

—হুজুরাইন আপ্?

—বিখ্নি মরে গেছে যে। শনিচরী হাসল। তারপর ভিড়েব পেছনে চেনা-চেনা মুখ দেখে বলল, বুধুয়ার বউ? বহু তুইও আয়, গুলবদন, তুইও চল। গম্ভীর সিং মরছে, কেঁদে টাকা নিযে ওদের মুখে নুন ঘষে দে। লজ্জা কি? যা পারিস উসুল করে নে। চল চল। সব মাথাপিছু পাঁচ টাকা, সবাই চাল পাবি, কিরিয়াতে কাপড়।

বেশ্যাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যুবতী বেশ্যারা বলল, আমরা?

—সবাই চল। বুড়ো হলে এ কাজ তো করতে হবে, আমি থাকতে থাকতে তোদের হাতেখড়ি করে দিই?

অসম্ভব মজা পেল সবাই। শনিচরীকে মোড়া পেতে বসাল গাঙ্গু। রূপা চা কিনে আনল, বিড়ি। কিসের যেন উত্তেজনা। তারপর সবাই চলল নওয়াগড়।

গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজা, গোমস্তা, সবাই দেখে তাজ্জব বনে গেল। গোমস্তা হিসহিসিয়ে বলল, রাণ্ডীটোলী ঝেঁটিয়ে এনেছিস? প্রায় একশো রাণ্ডী?

শনিচরী বলল, কাঁয় নেই? মালিক বলেছে, কিস্‌সা-কাহিনী হয় এমন শোর মচাবি। তা দশটা রাণ্ডীতে কিস্‌সা কাহিনী হয়? সর সর, আমাদের কাজ আমাদের করতে দাও। মালিক এখন আমাদের।

গম্ভীরের লাশে ঘা পচা গন্ধ। ওর পেটফোলা লাশ ঘিরে রুদালী রাণ্ডীরা মাথা কুটে কাঁদতে লাগল। গোমস্তার চোখ ফেটে দুঃখে জল এল। কিছুই বাঁচবে না গো। ওই মাথা কুটাকুটিটা শনিচরীর খচড়াই। মাথা কুটলে দুনো টাকা! ভাতিজা আর গোমস্তা দাঁড়িয়ে রইল অসহায় দর্শক। মাথা কুটতে কুটতে, কাঁদতে কাঁদতে, গুলবদন শুকনো চোখ বিশ্রীভাবে মটকে ভাতিজার দিকে চেয়ে হাসল। তারপর কান পেতে শনিচরীর কাঁদা শুনে দোহার ধরল।

টুং-কুড়

ধানকাটা হয়ে গেছে। "ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়" এখন কবিতার লাইনমাত্র। কেন না মণ্ডল ধানের ভাগের সঙ্গে খড়ের ভাগও নেয়। সবই নেয় সে। এদিক ওদিক পড়ে থাকা ধানের শিষ শুধু আলতাদাসী নেয়। আজও নিল।

আলতাদাসী ধানের শিষ নিলে কেউ কিছু বলে না। ওরা জানে, আলতাদাসীর অনেক নেবার, অনেক পাবার কথা ছিল। কিছুই সে নিতে পারেনি। তাই সে ধান নেয় কুড়িয়ে। আঁধারে আসে আলতাদাসী। ঠিক যেন এক প্রেতিনী। প্রেতিনীর মত নিঃশব্দে আসে ও নিঃশব্দে ফিরে যায় ঘরে।

আগে ও শনশন করে বাতাসের আগে আসত, বাতাসের আগে যেত। এখন ও ভরা পোয়াতি। পূর্ণগর্ভ টেনে চলতে কষ্ট হয় ওর। মণ্ডলের নাতিটা ওকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আলতাদাসীর পেট ছেড়ে বেরোতে যেন বড় ব্যস্ত হয়েছে। পেটে ছেলে লাফায়, যেন কিল মেরে বলে, আমি বেরোব।

বেরোবি, মাটিতে পড়বি, এত তোর ব্যস্ততা কিসের? বেরিয়ে কি দেখবি তুই? ধানে চালে মাছে দুধে তেলে কাপড়ে এক সোনার রূপকথা? গোয়ালে গরু, চালে খড়, অঘ্রানে নবান?

তেমন হয়, তেমন হয়, তেমন হয়।

মণ্ডলের বড় ছেলের বউ হবে, সে বউ পোয়াতি হবে, তার ছেলে তেমন অসচ্ছল সুখের সংসার দেখবে।

আমি তো আলতাদাসী, আরকপালী, ছারকপালী। দুলে ঘরের মেয়ে। আজকাল মুনিষ ছেলেও সাইকেল ঘড়ি চায় বলে আমার বর জোটেনা। বাপ নেই, মায়ের সঙ্গে পাট কাজ করি, মণ্ডলদের ধান রুই, ধান কাটি। এমনি করে করে আমি ষোল পেরোই, সতেরো। বৈশাখের ঝড়ে সব ধুলোয় ধুলো, অন্ধকার, বাগানে আম। টৌকাই মণ্ডলদের বড় ছেলে আমার কোমর জাপটে আমাকে ঘরে টেনে নিল। ওদের বাড়ির পেছনে আমবাগান, আর সার সার ঘর। একসময়ে ঘরে ঘরে ওদের মাহিন্দার থাকত। এখন ঘরগুলিতে রাখা হয় শুকনো কাঠপাতা, গোবর সার। একটা ঘর আন্দিবুড়ির ঘর। আন্দি এ গ্রামের এক প্রাচীন কুঠে বুড়ি। ওই ঘরে থাকে ও, মণ্ডল বউ তাকে চাল নুন-তেল-আনাজ দেয়।

এটি মণ্ডলগিন্নির মহানুভবতা নয়। আন্দিবুড়ি তার দিদিশাশুড়ি। মণ্ডলের ঠাকুমা। মণ্ডলবাড়ির ইতিহাস নষ্ট রক্তের ইতিহাস। আন্দি যখন বউ, তার স্বামী থাকত শহরে। বাড়ির এক মাহিন্দারের সাহায্যে পর পর তিনটি ছেলে মেয়ে এনে মণ্ডল বংশকে বাঁচায় আন্দি।

কাজ ফুরালে মাহিন্দারটিকে চুরির দায়ে জেলে পাঠানো হয়। আন্দিকে সেদিন কেউ বের করে দেয়নি বাইরে। যে আন্দি যৌবনে স্বামীসঙ্গ পায়নি, যৌবন ঢলতে তার ওপর স্বামীকৃপা হল। নিজের কুষ্ঠরোগ আন্দিকে দিয়ে, গর্ভে এক ছেলে দিয়ে স্বামী মরে যায়।

তারপর ক্রমে ক্রমে দেহ গলে পড়তে আন্দিকে বের করে দেওয়া হয়।

সেও অনেকদিনের কথা। খুবই আশ্চর্য, আন্দি আজও মরেনি। নাকটি তার কোটর, আঙুলগুলি গলে গেছে প্রায়, কিন্তু দেহের ধ্বংস একটা সীমা অবধি গিয়ে কেন যেন থেমে গেছে। আন্দি বসে বসে বাগান পাহারা দেয়।

সেই সব পোড়ো ঘরের একটিতেই আলতাদাসীকে টেনে নিয়ে যায় মণ্ডলের বড়-ছেলে। বৈশাখী ঝড়ের দুপুরে। ঝড়ের পর বৃষ্টি নেমেছিল। ভেজা আঁচল গুছোতো গুছোতে আলতাদাসী ঘরে ফিরেছিল।

তারপর মণ্ডলের ছেলে গোপাল সরাসরি ওর ঘরেই আসত। অন্তত কয়েক মাস ধরে। সময়টা গোপাল ভালই বেছেছিল। দুলে পাড়ার ডাকাবুকো ছেলেগুলির সবে হাজত বাস হয়েছে মাস ছয়েক কেস চলার পর। ধানকাটার হাঙ্গামায় বন্দী, মামলার সময়ে তারা সবাই ডাকাতি কেসে প্রোমোশন পায়। ওরা গ্রামে থাকলে গোপাল সাহস পেত না।

অন্যেরা নিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়েছিল। এ রকমই হয। মণ্ডলদের ছেলে বল, কর্তা বল, পর গোয়ালে জাবনা খাওয়া ওদের অনেক দিনের অভ্যাস।

আলতাদাসীর মা বলত, কি করবি?

আমি জানি?

ছেলে হোক, মেয়ে হোক, একটা তো হবে। তা নিয়ে কি ভিখ্ মেঙে খাবি?

আমি জানি?

তবে কে জানে? তুলসীর বিয়ে কি করে দেব মা?

আমাকে আম কুড়োতে পাঠিয়েছিলে কেন? তখন মনে পড়ী না? এখন এত কথা বলছ?

তুই তো জলাঞ্জলি গেলি। তুলোসীর কি হবে?

তার বিয়েব আগে চলে যাব।

যেমন কথা তেমন কাজ। তুলোসীর সঙ্গে গড়াইদের মুনিষ বিশালের বিয়ের আগেই আলতাদাসী চলে গিয়েছিল মানিকের বাড়ি। মানিক জেলে যাবার পর থেকে তার মা বউ বড়ছেলের বাড়ি। মানিকের ঘব ভিটে সব এখন মণ্ডলদেব। তবে দখল নেয় নি। একজনেব বাসবসতের ভিটেতে চট করে আরেকজন ঘর তোলে না, চাষবাস করে না। ফেলে যাওযা ভিটের গাছগাছালিতে, কপাট-জানালা উপড়ানো গহ্বরে অনেক দিন অবধি ঘর ছেড়ে যাবার ব্যথা ও বেদনা লেগে থাকে। আরো বহুদিন কাটলে তবে সে ব্যথা বেদনা সবে যায় কিংবা যায না। পোড়ো ভিটের বোবা কান্নার কথা কেউ লেখে নি, তার কোন দলিল নেই।

আলতাদাসী সেখানেই গিয়ে উঠল। একা একা পোড়ো ঘরে কে থাকে বা? আলতাদাসী থাকে। তার কি ভয নেই? গোপালের এটো ও, ওকে কেউ ঘাঁটাবে না; যদি সে কথা না মানে তাহলে কি হবে?

তা আমি জানি? তোর মুখে ওই এক কথা।

জানি না বলে ওই কথা বলি। আর কি বলব? তুমি বল, কি করবি? তা আমার কি আগে এমন দশা হয়েছে যে জানব কি করব? তুমি বল, ভিখ মাঙবি? তাই কি জানি? তুমি বল যদি ছয় মাস পোয়াতি না মেনে লোক ঢোকে তাহলে কি হবে? তাই কি আমি জানি? সত্যি কথা বলি, তা তোমার পছন্দ হয় না। আর আমার যা হোক তা হবে তুমি ভাব কেন? তুমি তোমার তুলোসীর বিয়ে দাও গে।

মা অবাক মেনেছিল। গাঁয়ে সবাই অবাক। এ কি মেয়ে মা? পেটের কাঁটা খসালি না, তা না খসালি। তুই তো প্রথম নোস। মণ্ডলরা এমন অনেক মেয়ে নষ্ট করেছে। তারা কেউ মরেছে আত্মঘাতী হয়ে, কেউ ভিখ মাঙতে বেরিয়েছে, কেউ জারজ ছেলেকে নিয়ে গ্রামেই থেকে গেছে।

কেউ হনহনিয়ে গিয়ে মানিকের ভিটেয় ওঠেনি। মানিকের ঘরের চারদিকে লাগাও আরো বাড়ি। কিন্তু তোকে যদি মারতে আসে মণ্ডলরা? তাহলে?

তখন কি হবে তা আমি জানি?

পোড়ো ঘরে চাটাইয়ের শয্যে হল। আবার আলতাদাসী পাট কাজে গেল গড়াইদের বাড়ি। আবার কাঠ কুড়োতে গেল মণ্ডলদের আমবাগানে। বেশির ভাগ গাছ আফলা হয়ে গেছের গাছগুলো সব আন্দিবুড়ির। মণ্ডলদের ভোগে কাজে লাগে না। আর। ওই জ্বালানি জোগায়, ব্যস। পাঁচ শরিকে বিবাদ। নইলে আম বাগান কবে ওরা বেচে দিত।

আলতাদাসী হাঁপিয়ে মরে কাঠ কুড়োতে, খানিক জিরোয়।

আন্দিবুড়ি বলে, এ কে এলি? আলতাদাসী?

আলতাদাসী জবাব দেয় না।

শুনেছি তোকে নষ্ট করেছে গোপাল?

আলতাদাসী জবাব দেয় না।

জমি চেয়ে নে, টাকা চেয়ে নে। ছেলে মানুষ করতে হবে না? পেট থেকে পড়বে ছেলে, খেতে দিতে হবে না?

আলতাদাসী জবাব দেয় না।

সবে রক্তের দোষ, জন্মের দোষ রে! কোনো ছেলেটা মা-বোন মানতে জানে না।

আলতাদাসী জবাব দেয় না।

পোড়ো ঘরে আগড় নেই। রাতে ভয় ভয় করে। আলতাদাসী রাত কাটায় বসে, ঘুমোয় ভোরের সুবাতাসে। রাতে বসে বসে মনের মধ্যেই পাক খায় সাপ। সাপের বিষে বড় জ্বালা, স্মৃতিতে বড় জ্বালা।

—দে দেব, ধান জমি দেব এই এত্ত জমি।

আলতাদাসীর চোখ জ্বালা করে।

—লিখে পড়ে দেব।

আলতাদাসীর মন জ্বালা করে।

—ঘর তুলে দেব, চৌচালা ঘর।

আলতাদাসী ভীষণ রাগে তুষের আগুনে পোড়ে। পুড়ে পুড়ে জ্বলে জ্বলে ওর রাত কাটে।

দু দিন না যেতে তুলোসী আসে, তুলসীদাসী। ঘরে চল্ দিদি। মণ্ডলকর্তা বলছে।

কেন?

রেগে গেছে খুব। বলছে, তোর বা কি মতলব্ আছে, তাতেই এসে এখানে উঠেছিস্।

তুই যা।

যাবি না?

না।

মাকে বলি গে, তুই যাবি না?

বলিস।

মণ্ডলকর্তা বলেছে, তুই তাদের বিপদে ফেলতে চাস। তাতেই এসে ডাকাতপাড়ায় উঠেছিস।

কাকে বলেছে?

মাকে।

মা এসেও সেই কথাই বলে যায়। ভীষণ, ভীষণ রেগে গেছে মণ্ডলকর্তা, আর সে রেগে গেছে বলেই মা ভয় পাচ্ছে খুব। মণ্ডলকর্তা

মানছে না যে গোপালই আলতাদাসীর অজাত সন্তানের বাপ। সে বলচে, নগনের বেটি আলতাদাসীর অজাত সন্তানের বাপ। সে বলছে, নগনের বেটি আলতাদাসী কোথায় কার সঙ্গে নষ্ট হয়েছে। এখন সে দোষ গোপালের ঘাড়ে চাপাতে চায় বলে এই নাটক করছে। এই ভাবে নাটক করে আলতাদাসী আর নগেনের বউ মোচড় দিয়ে কিছু বের করে নিতে চায়। সে গুড়ে বালি। মণ্ডলকর্তার এখনো বেঁচে আছে।

মণ্ডলকর্তার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। গ্রামের মেয়ে বউ মানে নি মণ্ডলরা। যখন ইচ্ছে ভোগ করেছে। জারজ সন্তানেব জন্মও দিযেছ সে সব মেয়ে বউ। কিন্তু কখনো কেউ গিয়ে অন্যত্র ওঠেনি।

আলতাদাসী বলে, ঘরে যাও।

মারে যদি তোকে?

আলতাদাসী বলে, বেশ চেঁচিযেই বলে, মার দিলে মার খাবে।

এ কথা সে একেবারেই বলে না। আবাবও বলে। চুরি ডাকাতি ঠেকাতে গ্রামে যখন কমিটি হয়, পঞ্চায়েত প্রধান আর ঝাণ্ডাবাহী ছেলেবা আসে মিটিং করতে। সেই মিটিংযে হনহনিযে চলে যায় আলতাদাসী। একটু দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে নিজের কলঙ্কের কথা। নামটা বেশ স্পষ্ট করে বলে গোপালের আব মণ্ডলেব। রুক্ষ চুল ওড়ে ওর, বলে, ছেলের পাপ গর্ভে বইছি, বাপ বলছে ঠেঙাব। এর ফয়সালা করে দিযে যাও।

ফয়সালা হয় না, মণ্ডলদের মুখ হাসে। আর গ্রামের অন্ত্যজ পাড়ায় এর ফলে আশ্চয প্রতিক্রিয়া হয। দীর্ঘ সময়কাল ধবে দেওযানি ও ফৌজদারী মামলা চালিয়ে মণ্ডল ওদের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। মামলার রায় ওদের বিপক্ষে যায়। ফলে ওরা ভাগ্যবাদী হয়ে হতাশায় ভেসে চলেছিল। রাগে হতাশায় পাগল পাগল আলতাদাসী যখন ঘর ছেড়ে আসে, কেউ এসে তার পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আলতাদাসী

যখন মনের জ্বালায় কথাগুলো বলে এল ওরা যেন ছাই সরিয়ে নিজেদের কণা কণা মনুষ্যত্ব খুঁজে পেল।

কাজ হোক না হোক, এমন করে বলল তো! বলা যায়, তাহলে বলা যায়।

সেদিনই সন্ধ্যায় সনাতনের মা এসে আতলাদাসীর কাছে শুল। তার বড় ছেলে শুল দাওয়ায়। পরদিন গড়াইদের পাটকাজ করার সময়ে ভগীরথের বোন ওকে সঙ্গে নিয়ে গেল। তারপর একদিন সনাতনের মা বলল, ভরা মাসে তুই ধান কাটতে যাস নে মা। মা ছেলে দুজনে দু ঠাঁই হ, তারপর আবার খাটিস।

আলতাদাসীর অজাত সন্তানকে বাঁচানো এখন যেন সনাতনের মায়ের দায়। গর্ভের সেই শিশু আব গোপন লজ্জার স্মারক নয়, পাপের ফল নয়। ওই শিশুকে ঘিরে গ্রামে খুব তাড়াতাড়ি শিবির ভাগ হয়ে গেল। ভগীরথের বোন প্রথম সে কথা ঘোষণা করে এল। গড়াইদের বাড়ির গোযাল কাড়তে গিযে।

ভগীরথেব বোন তেনযনীর মুখে বড ধার। গড়াইগিন্নি ওকে জলপানের মুড়ি ঢেলে দিযে বলল, নগনের মেয়েকে ঘবে তুললি কেন রে?

তুলব না কেন?

কেলেঙ্কাবি করে এল, তাকে নিয়ে ঢলাঢলি—

কি হয়েছে?

অন্যায নয় সেটা?

একশো বার অন্যায। গোপাল মোড়লের অন্যায়। তোমাদের ঘরের ছেলেরা আমাদের ঘরের মেয়ে বউয়ের লালচে মরে, সেটা অন্যায় হয় না? যত দোষ নগনের মেয়ের? বলি পেটের ওটা কি শূন্য হতে এল?

তাই বলছি?

তবে কি বলছ? বুঝি না মা তোমার কথা। তুমিও আমার কথা বোঝ না। তুমি নয় বাবুকে শুধোও।

এ কথায় গড়াইগিন্নি চুপ। গড়াইকর্তা একই বাড়িতে দীর্ঘকাল বিধবা ভাইবউযেব সঙ্গে বাস করেছেন। তেনয়নী সেই খোঁচাটাই দিয়ে গেল। তোমাদেব ঘরে ভাসুর-ভাদ্রবউ একসঙ্গে থাকলে কেলেঙ্কারি হয না। আমাদের নির্দোষী মেযেকে বাবুরা নষ্ট কবলে কেলেঙ্কারি!

কথাটি গড়াইগিন্নিকে হজম কবতে হল। বাড়িতে জামাই আছে। এ সব কথা তিনি মোটে চান না। তেনযনী সুযোগ পেয়ে বলল। এ বাড়িতে বিধবা ছোটগিন্নির হঠাৎ কবে ছেলে হল, তোমবা বললে স্বপ্নে শিব এসেছিল। তাতেই কেলেঙ্কাবি হল না। আমাদেব ঘরে স্বপ্নে শিবঠাকুবও আসে না। তাতেই কেলেঙ্কাবি হয়! ভদ্রলোকে ছোটলোকে তফাত থাকবে না? শিব যে ছোটজাতের ঘর চেনে না।

গড়াইকর্তা সব শুনে বললেন, এখন ওদেব দিন পড়েছে, বলছে। তবে মণ্ডল অমন চেটাং চেটাং কবতে গিয়ে আমাদেব মুখও পুড়িয়েছে। সেই থেকেই এত কথা।

আলতাদাসী এত সবেব কাবণ। আলতাদাসীব কপালে যা ঘটেছে, তাতে ও ছাইকুড়ানি, পাঁশকুড়ানি তাতে ও পথে ফেলা এঁটো শালপাতা বই তো নয। তাই হত। কিন্তু সবটুকু ঘটল এমন সময়ে, যখন গ্রামেব লোকগুলির মনের জমিনে এলোমেলো নানা বীজের পোড়তলা। এই মানুষ, এই মানবজমিনে শুধু বঞ্চনা ও নিপীড়নের আবাদ চলে। ফলে অদ্ভুত সব বীজেব অঙ্কুর গজায।

এক আশ্চর্য সমযে আলতাদাসী পোয়াতি হয়। দীর্ঘদিন এখানে সেই রাজনীতির আন্দোলন। দশ বছর আগে বাতাস অন্যরকম ছিল। কিন্তু কোথায় কোথায পঞ্চাযেত আপিস ঘেরাও হচ্ছে। হাইকোর্টের

ইনজাংশন উপেক্ষা করে বর্গাদার ধান কাটবে বলে বাঁকানো কাস্তেতে শান দিচ্ছে। এসব কথা হাওয়ায় ভাসে। ওকড়ার বীজ যেন, যেখানে পড়বে সে জমি যত রুক্ষ হোক, ওকড়ার বন গজাবে।

এখন আলতাদাসীকে ঘিরে সন্ধ্যেবেলা আশ্চর্য সব কথা বলে কেউ কেউ। ভয় আর হতাশার নিচে কথাগুলি বেঁচে ছিল কে জানত!

খেজুর পাতার চেটাই বোনে মেয়ে পুরুষে। বুনতে বুনতে হঠাৎ ভগীরথ বলে, মধু হাঁসদা কি মরত? ওই লক্ষ্মীকান্ত বেরা পুলিস নিয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাটি এগারো বছরের না হোক দশ বছরের পুরনো। লক্ষ্মীকান্ত বেরার কথা বলে ভগীরথ আর সেই সঙ্গেই বলে, বেরা, মণ্ডল, গড়াই সব এক গোয়ালের গরু। এখানে কোনো মধু মাস্টার নেই বলে কোনো হাঙ্গামা হয় না।

তেনয়নী বলে, তখন ক'বছর কোনো জনা আমাদের মেয়ে বউ নিয়ে টানাটানি করেনি। ভয় পেয়েছে কত।

সনাতনের মা বলে, মতেউরকে মনে আছে? শশীবাবুর গলায় পা রেখে জিভ টেনে কবুল করাল। প্রসাদীকে নষ্ট করেছি, যেমন যেমন, দশ বিঘা জমি দেব।

আদায় হয়েছিল।

আমার জন্য'ই আর সব ছেলেদের মিছে মামলায় ফাঁসাল যে। ওরা বলে আদালতের নিষেধ মানি না, ধান কাটব ঘরে নেব, তাতেই তো! নইলে ওরা থাকলে...

এইসব চিন্তা ভাবনায় ফসল ওদের মনে বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছের ফসল হয়, সে ফসল পাকে।

আর ধান পাকে।

আলতাদাসী যায় ধান কুড়োতে। ওকে ধান কাটতে দেয় না

কেউ। তবু ও কুড়োয়। না, তোমরা দিচ্ছ বলেই হাত পেতে নেব না। যত পারি কুড়িয়ে আনব।

আর এমনি ধান কাটতে কাটতে ওরা চেয়ে দেখে ওদের বড় সাধ ভালবাসার চার বিঘা জমি। এক লপ্তে চার বিঘা জমি। এড়ানচেড়ান অযত্নের চাষ। এই জমি নিযেই মামলা বিরোধ সব। নিজের দখল রাখতে মগুল মাহিন্দার দিয়ে চাষ করিয়েছে। অযত্নের চাষ। তবু ধান, তবু পাকা ধান। মাহিন্দার কাটবে, না ভাড়া করা মুনিষ?

ধান কাটাব সময়ে মগুল দাঁড়িয়ে থাকে। হিংস্র চোখে দেখে আলতাদাসীকে। এখন আলতাদাসীর হাতে লোহার কড়া। সনাতনের মা পরিয়ে দিয়েছে। আলতাদাসীর মান এনে দিয়েছে। মগুলের চোখে বিষ, এখন তুই ভরা পোযাতি, লোহা থাকলে ভয় নেই। যা যা, আপদবালাই দূরে যা।

এই ঝড়ে পড়া ধান কুড়োতে কুড়োতে, কাস্তের ঘায়ে কেটে পড়া ধানের শিষ কুড়াতে কুড়াতে আলতাদাসীর ব্যথা ওঠে। কি কাণ্ড মা, কি কাণ্ড! ধরাধরি করে ঘরে নেবে কি, ব্যথায আলতাদাসী ওলট পালট খায়। তেনয়নী ছুটে আসে ধামা নিযে। ধামা উপুড করে চেপে ধরুক আলতাদাসী, ব্যথায় জোর আসবে। কাঁদিস না মা কাঁদিস না, কান্না চাপ, তাড়াতাড়ি ছেলে হবে। মেয়েরা ঘিরে ধরে আলতাদাসীকে। তুলোসীদাসী আনে বাঁশের চেঁচাড় আর শক্ত সুতো। ধানকাটা শেষ না হতে মাঠটি হয় আলতাদাসীর সন্তানের শয্যা।

পুরুষরা দূরে সরে বিড়ি ধরায় ও অবাক মেনে মহাখুশিতে বলে, খুব হয়েছে মগুলের। এখন মাঠ তো অশুচ হল।

পুজো দাও, শুদ্ধ কর।

ভগীরথ বলে দূর! মাঠ অশুচ হয় না।

কেন? কেন?

তিনি ধান বিয়োচ্ছেন, এ ছেলে বিয়োচ্ছে—তিনি কি অশুচ হচ্ছেন!

জ্ঞানের কথা রাখো দেখি। মণ্ডলের দণ্ড হোক খানিক।

আজ ওরা নিজেরাই নিজেদের ছুটি দেয় ও দূর থেকে মণ্ডলকে আসতে দেখে ফুক্কুড়ি করে শিয়াল ডাক ডেকে ওঠে। তারপর সমস্বরে হেঁকে, আলতাদাসীর ছেলে হল, মণ্ডলকর্তার নাতি হল, এবার আমরা মিঠাই খাব গো! বলে এক সঙ্গে দুদ্দাড় পালায়। মণ্ডলকর্তার কানে কথাগুলো ঠিকই যায়। ভীষণ রাগে ফুঁসতে থাকে সে।

কি হয়েছে, কোথায় হয়েছে?

তেনযনী চিল চীৎকারে বলে, আলতাদাসীর ছেলে হয়েছে গো। এদিকে এস না।

মণ্ডলকর্তা রাগে এখন দিশেহারা। বটে! আছড়ে মেরে ফেলব সাপের ডেঁকো, আছড়ে মারব। বলে সে তেড়ে আসে। এখন তাকে খ্যাপা মোষের মতই দেখায়। বড় ভীষণ রাগ মণ্ডলকর্তার, বড় ভয়াল সে। তেনয়নীরা সমস্বরে চেঁচায়, সনাতন রে! ভগীরথ!

সনাতনরা আসে, আসে মণ্ডল কর্তার মুনিষ মাহিন্দাররা। তেনযনীরা আলতাদাসীকে আগলে রাখে।

কি হয়েছে, কি হল? আমরা বাঁশ আনতে যাচ্ছিলাম, খাটুলিতে আলতাদাসীকে ঘরে নেব।

অবসন্ন, রক্তাক্ত আলতাদাসী মাটিতে শুয়েই হাত তুলে দেখায় মণ্ডলকর্তাকে। বলে, ছেলে মারতে এসেছে।

মারবে! ছেলে!

ভগীরথ মণ্ডলকর্তার কনুই ধরে টেনে ও পাশে সরায়। বলে, এদিকে এসো কর্তা। কোথায় যাচ্ছেন?

মেরে ফেলব ওটাকে। রতন কোথায়, হারাণ?

রতন ও হারাণ মণ্ডলের মাহিন্দার। তাদের দেখা যায় না। মণ্ডলকে ভগীরথ এখানে ধরে থাকে ও সনাতন বলে, তারা কেউ নেই কর্তা।

মণ্ডলের মাথায় রক্তাক্ত কুয়াশা ক্রমে সরতে থাকে। কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। সনাতন ও ভগীরথ তার এত কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে কেন? মণ্ডল কনুইটা ছাড়িয়ে নেয় ঝটকা মেরে। হারাণ, রতন, তার ছেলে গোপাল, কেউ আসে না কেন? সনাতনের ভাই জনাই, ভগীরথের ছেলে বিজয়, সকলকে মণ্ডল সেদিনই হাজতবাসী করেছে। জজ রায় দিলে মণ্ডল কি করবে? মজিদ শেখ ফসফস করে বিড়ি টানছে। ওর ভাগ্নে আর ভাইও ওই বিতর্কিত জমিতে বর্গা দাবীদার। ধান ক্ষেতে নিমনিমে সন্ধ্যায় এতগুলো শত্তুরের মাঝে সে কি করছে।

কিন্তু ভয় পেয়েছে তা একবাব বুঝতে দিয়েছে কি মণ্ডল, খুঁটি তোমার নড়ে গেল। সেদিন নগেনেব মেয়ের অকথা কুকথাঁব ফলে দশটা গ্রামে তার মুখ হেসেছে। দশটা গ্রামের লোকই ছিল সেখানে একজন দু'জন করে। সেদিন মুখ পুড়েছে, সেই থেকে লোকজনের চোখের চাহনি দুর্বোধ্য হচ্ছে, করা যেন কোথায় আন্দোলন করছে জোরদার, বারবার থানা ঘেরাও করছে, কর্মীদের ধরলে তাদেব খালাস করে আনছে—এদের চোখগুলোতে যেন হুম্‌কি থাকে —না, মণ্ডল এখন ভয়ের কথা জানতে দেবে না।

পথ ছাড় সনাতন, যাই।

সনাতনবা কথা বলে না। চেয়ে থাকে।

পথ ছাড়।

ওরা চেয়ে থাকে।

পথ...ছাড়....

মজিদ বলে, না কর্তা।

পথ ছাড়বি না?

ভগীরথ বলে, আগে তুমি ফয়সলা কর।

কিসের?

কিসের তা ভালই বুঝছ। আমরা মেয়ে পুরুষে বিশজনা থানায় সাক্ষী দেব যে তোমার ছেলে নগেনের মেয়েকে নষ্ট করেছে। সে কথা সেদিন বহুতজনে শুনেছে।

সবাই বলে, তারাও বলবে।

ভগীরথের মনে বিজয়ের ক্রুদ্ধ, অসহায় মুখ ভাসে। এখন ওর গলা চড়াতে থাকে, তারপর তুমি নগেনের বউকে হুমকি দিয়েছে, সে কথাও সবাই জানে।

হেই ভগীরথ! শোন....

তোমার কথা আমরা নিত্য শুনি, তুমি নয় একদিন শুনলে! আজ তুমি ছেলে মারতে এসেছ। বার বার ঘুঘু ধান খাবে, নিত্য পার পাবে? তাই পায়? মিছে মামলা করে পার পেয়েছ, খুন করে পার পেতে চাও?

ফয়সালা হোক! ফয়সালা! সবাই চেঁচিয়ে ওঠে। এ সময়ে নিতাইরা কাকে যেন টেনে আনে ও হেঁকে বলে, কাজের কাজীকে এনেছি গো সনাতন কাকা! ইনি আবার বন্দুক খুঁজছিল।

গোপালকে ওরা ঠেলে দেয় ও বলে, এই যে!—গোপাল ধপাস করে পড়ে যায় ও নিতাই ওকে টেনে দাঁড় করায়। ভগীরথের মাথার আগুন জ্বলে। গোপালকে সে মুনিযখাটা হাতে প্রবল চড় মারে ও বলে, বন্দুক আনছিল, বন্দুক! বাপের কাঁধে হাগে ব্যাটা। কি কর্তা, কবুল করাচ্ছি, শুনবে? কি গোপালবাবু। নগেনের মেয়েকে নষ্ট করেছে কে?

গণধোলাইয়ে ডাকাত নিহত গোছের সংবাদ, যা নিযত পড়া যায়, তা গোপালের মনে ঝলকে ওঠে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, আমি, আমি!

তেনয়েনী চিল চিৎকারে বলে, আলতাদাসী বলছে, তাকে জমি দেবে, ঘর তুলে দেবে বলেছিলে?

বলেছিলে?

সনাতনের থাপ্পড়ে গোপালের নাক থেঁতলে যায়! সে কেঁদে ফেলে ও বলে, বলেছিলাম।

মার ব্যাটাকে—চেঁচিয়ে ওঠে কে। ভগীরথ বলে, ছেলে কবুল গেল, এখন তুমি বল।

মণ্ডলের চার পাশে সব ধসে পড়তে থাকে। সে বলে, দেব, জমি দেব।

আজ বলছ, কাল থানায় যাবে।

না, যাব না।

সাপের ডেঁকোকে বিশ্বাস কি! মাহিন্দার হতে তোমাদেব বংশ হল, তাকে জেলে ঢোকালে। তুমি টাকা দাও।

কত টাকা?

পাঁচ হাজার টাকা দেবে কর্তা। ভগীরথ নিজের গলা শুনে তাজ্জব বনে যায়। আলতাদাসী তাকে লড়াকু করে ছাড়ল? এ সাহস তার কোথায় ছিল লুকানো? সে বলে, তা হলে জমি হয়, ঘর ওঠে, ছেলেটা বেঁচে থাকে।

তাই হবে।

হবে না, হোক।—ভগীরথ সকলেব দিকে চেয়ে বলে, যখনকার কথা তখন কাজ না হলে হয় না। ঠাণ্ডা মেরে যায়। তখন যেয়ে পাঁশগাদায় পড়লে আমাদের কথা, ওনার কাজ।

সবাই হই হই করে ওঠে। সনাতন মহোল্লাসে বলে, সকালে উঠে নিত্যি গাধা দেখা রে ভগীরথ। আজ দেখেছিলাম। কি দিনটা গেল তাই বল?

দেখো। তোমার গাধা নিত্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবে—সবাই হেসে ওঠে।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। আলতাদাসী আজকের রানী। কোলের কাছে ছেলে নিয়ে খড়ের বিছানায় ঘুমোচ্ছে।

বাইরের ও ঘরের দাওয়ায় বসে পুরুষরা জটলা করে। ভগীরথ

বলে, কাল বগুলের কাজ তুলে দিয়ে পরশু থেকে বিবাদী জমিতে লাগতে হচ্ছে। ধান উঠবে আমাদের ঘরে।

মজিদ শেখ বলে, বিবাদ হলে কি করবে তা ভেবেছ? বিবাদ হবেই হবে।

ভেবেছি।

তোমরা কি ভেবেছ? আমি তো কাল একরামপুর যাচ্ছি। সেখানে ওরা লড়াই লড়ে এ সব ফয়সলা করছে।

তুমি কি একলা যাবে? আমরাও যাব।

একরামপুরে এখন আন্দোলন চলছে।

[টুং-কুড় শব্দটি ঝাড়খণ্ডের। ''ফসল কাটার সময়ে কাস্তের ঘায়ে অনেক সময়ে টুকরো টুকরো ধানের শিষ জমিতে পড়ে যায়। এগুলোর নাম ''টুং'' এবং ''কুড়'' মানে গাদা, ডাঁই।'']—লেখক

গো হু ম নি

গোহুমন হল গোখরো সাপ। তা বিশাল ভূঁইয়ার বিধবাকে সবাই গোহুমনি বলে। নাম একটা ওর ছিল, ঝালো। তা কতকাল ধরেই তো ওর নাম ছিল সোনা দাসীর মা। ছেলে আর মেয়ে হলে কে আর কাকে "ঝালো" বলবে তাই বলো? বলাটা ঠিকও নয়।

কেচকি গ্রামের ঝালো ভূঁইন কেন "গোহুমনি" নামে পরিচিত তা জানতে চেয়েছিল লছমন সিং। লছমন সিং ঠিকাদার। ঠিকাদারিতে ওর না কি লাইসেন্ আছে।

একথা অবশ্যই বিশাল ভূঁইয়াব দাদা সাতবান স্বীকার করেনি। সাতবান কেচকির কামিয়া সমাজে একজন মাতব্বর লোক বলে গণ্য হয়, কেননা সে সকলকে নিয়ে দল পাকিয়ে বহোত ঝামেলা তুলে কামিয়ৌতি ছাড়াবার কথা বলে।

কামিয়ৌতি থেকে খালাস মিলবে, অলীক, ঋণবদ্ধ ক্রীতদাসগুলি দাস অবস্থায় আধপেটা খেয়ে মরবে না,—মুক্ত অবস্থায় অনশনের অধিকার পাবে,—সে কথা কামিয়ারা ভাবে না।

ওরা জানে যে পূর্বপুরুষ ঋণ করে থাকে যদি তাহলেও ওরা কামিয়া।

নিজে ঋণ করলে তাহলেও কামিয়া।

পলামুর পাহাড়-জঙ্গল-নদী যতদিনের, কামিয়া-প্রথাও তেমনি পুরনো।

অন্তত তাই ওরা জানত। তবে বোর গ্রামের মাধো সিং খারোয়ার মাঝে মাঝে আসে। সে বলেছে, ওসব মিছে কথা।

—কি মিছে কথা?

—কামিয়ৌতি অত পুরনো নয়।

—কে বলল?

—লেখাপড়া করো জানতে পারবে।

—তুই তো অনেক পড়েছিস, এ মাধো। তুই বল্‌না? আমরা লেখাপড়া শিখব, বইকেতাব পড়ব, তবে জানব, তাহলে তো এ জন্মে হবে না।

—পলামুতে আগে চেরো জাতি রাজা ছিল। তারা কাউকে কখনো কামিয়া বানায় নি।

—কে বানাল?

—খারোয়ার জাতিও বিদ্রোহ করে আর ইংরেজের সঙ্গে বহোত হি লড়াই করে।

—নীলাম্বর আর পীতাম্বরের নাম তো আমরা জানি। ওরা খারোয়াই ছিল, তাই নয়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—আর কারা ছিল?

—ভৈয়া! চেরো, খারোয়ার, কোল জাতি, দুসাদ, গঞ্জু, ঘাসি, নাগেসিয়া, পারহাইয়া, এমন অনেক জাতই ছিল। অনেক জাতের মানুষ ছিল।

—এখনো তো আছে।

—তা তো আছে।

—এখন সব জাতে কামিয়া।

—সব পরে হয়েছে।

—কবে ?

—ওই তো মজা ভৈয়া। রাজপুত, পাঠান, সব এল মোগলদের পিট্ঠু হয়ে। মরাঠা এল, ইংরেজ এল—ওদের পিট্ঠু হয়ে যারা এল, ঔর এ জেলার মানুষদের ঠেঙাল, মারল—তারাই বেইমানির বখশিস পেল যত জাগীর-উগীর।

—তাই তো পেল।

—মহাজন, ব্যবসায়ী, পূজারী-পুরোহিতলোক, সব জমি-মালিক হতে থাকল।

—হাঁ হাঁ, পলামু কিনে নিল ওরা।

—তা ওরা কি হাতে করে জমি চষবে ? যে হাতে লাঙল ধরে চাষ করে, তাদের হাত থেকে জমিমালিকানা যখন চলে গেল, তখন তো ওইসব উঁচা জাতের লোকের কামিয়া দরকার হল।

—তাই বলো !

—কামিয়৾ৌতি আগে ছিল না ?

—কেমন করে থাকবে ? তুমি যতদিন নিজের... আরে ! ধরো না কেন, তুমি জমি মালিক। তুমি কি নিজে চাষ করবে, না লোক রাখবে ?

—জরুর নিজে চাষ করব। আবে ! জমি তৈরি করব। বীজ ছিটাব, নিড়ান দেব—সব নিজে করব। তখন হাতও চলবে চটপট।

—কিন্তু ব্রাহ্মণ, চাই রাজপুত, এরা ?

—বাপ্‌রে ! ওদের তো কামিয়া চাই।

—তবে ? বুঝেছ তো ?

—হাঁ বেটা, খুব বুঝেছি।

—এখন ভাবতে হবে.. কি, সোনার ভৈয়া ?

—বেটা ! তুমি যা বললে, তাতে তো বুঝলাম যে পলামুর মাটিতে কামিয়ৌতি বেশিদিনের নয়। তবে এত জলদি এ প্রথা এত বেড়ে গেল ?

—ভৈয়া। ধান-গম, কুরথি-মকাই চাষ হতে কযেক মাস লাগে। উখালার বীজ কত তাড়াতাড়ি ছড়ায় আর মাটিকে ঢেকে ফেলে তা বলো।

—মন্দ জিনিস তাড়াতাড়ি বাড়ে।

সাতবানের নাম সাতবাহন না সত্যবান নামের অপভ্রংশ তা জানা খুবই কঠিন। ছোট ভাই বিশালের মতই তার দেহের কাঠামোটা মস্ত বড়। সাতবানের বৈশিষ্ট্য হল ওর বুক পিঠ, কান, আঙুলের গাঁটে লোমের প্রাচুর্য।

মালিক নিম ও করঞ্জা বীজ থেকে তেল পিষে বের করে। সাতবান এই বিক্রীতব্য পণ্যটি সুযোগ পেলেই মাথা ও গায়ে মেখে নেয়। ওর এমন কাজ করার যুক্তি আছে।

গাছগুলো তো কারোই নয়। পঞ্চায়েতী কুয়া ঘিরে গাছগুলি আছে সবকারের জমিতে। মালিক তার ওপর দখল কায়েম করল কেন ?

ঠিক আছে। তর্কের খাতিরে মানা গেল যে মালিকের যে কোনো ব্যাপারে দখল ঘোষণা করার রীতি আছে। এটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

সাতবান হলদে দাঁতে হ-হ-হ শব্দে হেসে বলে, তাহলে আমিও একটা নিয়ম চালাচ্ছি বলতে পারো। মনিবের নিমতেল পেলেই মাখব, তার ক্ষেতের মূলা, বেগুন পেলে কাঁচা কাঁচাই খেযে নেব।

সাতবানের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল, সে কোনো ব্যাপার নিয়ে

বেশিক্ষণ কথা শুনতে পারে না। ঝটপট কাজের কথায় যেতে চায়।

সাতবানের বউ, ঝালোর বড়জা অথবা জ্যেঠাইন ছিল অন্যরকম। সে সামান্য ঘটনাকেও সবিস্তারে বলতে ভালোবাসত। সাতবান অত কথা শুনতে চাইত না। ফলে ওদের মধ্যে বেশ বিবাদ হত।

মাধোর কথা শুনতে শুনতে সাতবান হাতের তেলোতে খৈনি ডলে নেয়, মুখে দেয়, এবং বলে, বুঝলাম তো সবই। এখন কী করতে হবে তাই বলো।

—কিসের কী করবে?

—কামিয়া কি আমরা থেকেই যাব?

—কী করবে?

—কানুন করে তো এ নিয়ম উঠে গেছে।

মোরি পারহাইয়া বুড়ি হয়ে গেছে এখন। সে পিঠের কাপড় সরিয়ে বলে, এই দাগ? সাতবান?

—হাঁ হাঁ মোরি, ও কথা জানি।

—যখন জোয়ান ছিলাম, তখন...

—মালিক দেগে দিল লোহা পুড়িয়ে।

—তখন আমি জোয়ান। আর ...আমাকে যে বাবু বাখনি কবতে চেয়েছিল, সেই সরকারি ডাক্তারবাবু বলেছিল যে কামিয়ৌতি বেআইনি করে দিল সরকার। তাতেই তো আমি...

মোরির প্রৌঢ়া মেয়ে বাসনি বলে, খুব ভালো কাজ করছিলে। আমাকে ফেলে পালাচ্ছিলে বাবুর সঙ্গে।

মোরি বলে, কাহে ন ভাগি? তোহার বাপোয়া হমনিকে রোটি দেতের্ করত্ কা?

—তারপর?

মাধো সহাস্যে বলে। কেন না বহুবার শোনা এ কাহিনী। তবু যদি সে না শোনে কাহিনীটি, মোরি বড় দুঃখ পাবে।

বাপ্‌রে! মালিক তো আমাকে ধরে ফেলল। কি রে মোরি? কামিয়া হয়ে ভাগছিস তুই? বাবুর জাত উঁচা, জাত মারছিস! বাবুতো কুর্মী ছিল।

—-তারপর কী হল?

—আমি বহোত্ হি তেজী সে বললাম যে, বাবু সব বলেছে আমাকে। কামিয়ৌতি খতম এখন! তখন মালিক হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেল মাটিতে। আর তখন ওর গোরু দাগানো হচ্ছিল। হাসতে হাসতেই আমাকে চেপে ধরে পিঠ দেগে দিল। যা এখন! তোকে ছাপ দিয়ে দিলাম। পালালেই ধরা পড়বি।

—মৈয়া, তুমি কি খুব সুন্দরী ছিলে?

— আরে আরে! এ কত শরমের বাত বলছ।...তা, বনের মৌর যেমন পেখম খুলে নাচে, তখন কত না সুন্দর দেখায়। আমিও সুন্দরী ছিলাম ছোটবেলা থেকে। তাতেই নাম হল মোরি।

মোরি সকলের দিকে সগর্বে তাকায়। হতে পারে যে ঘটনাটি যাট-বাষট্টি বছর আগে ঘটেছিল। কিন্তু ঘটেছিল তো! এখন মোরির চেহারা রোগা কাকের মতো, কিন্তু একে সময়ে তো সে সুন্দরী ছিল।

বাসনি নিজে দিদিমা হয়ে গেছে, এতই তার বয়স। কিন্তু মার সঙ্গে তার ঝগড়া বা প্রতি কথায় মতান্তর, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে। এক চালাতেই বসবাস, একই সানকিতে ঘাটো খাওয়া, একই বিড়ি ভাগ করে টানা, তবু এ বিবাদ শেষ হয় না।

বাসনি বলে, মায়ের লাজশরম খুবই কম। এসব কথা বলতে লাজ লাগে না?

—সাতবান বোঝে, যে এখনি মোরি ও বাসনি ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু করতে পারে। তাই সে কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরায়।

—মোরি মৌসি যখন জোয়ান ছিল, সেই ষাট-পঁয়ষট সাল

আগেই কামিয়ৌতি বন্ধ, কানুন হয়েছিল কি রকম? এ কথা কি সত্যি?

—হাঁ হাঁ, কেন সত্যি হবে না? ইংরেজ সরকার তো তেষট্ বছর আগেই বিহার ঔর ওড়িশায় কামিয়ৌতি বন্ধ আইন করেছিল।

—তবে ফের কোন সাত বছর আগে কানুন করল ভারত সরকার? আগে তো কানুন ছিল।

—সে কানুনে কাজ হয় নি।

—এ কানুনে বা কি কাজ হচ্ছে?

—সরকারি দপ্তরে অনেক হচ্ছে।

—সে তো মিছা।

—ভৈয়া সাতবান। কামিয়া যদি খালাস চায় তো তাদেরকে এককাট্টা হতে হবে।

—তারপর?

—ছিন্‌লো খালাস। সরকার তো বলছে যে বন্ধুয়া লোক খালাস হবে, সকলের অনেক মদত মিলবে। পলামুতে এমন খুবই কম হয়েছে যদিও।

—তুমি বুঝিয়ে দাও তো আমাকে। সব বেটা কামিয়াকে বুঝাব আমি।

মোরি মাধোকে বলে, হাঁ হাঁ। সাতবানকে বুঝিয়ে দাও সব।

এমন এক দায়িত্ব পাবার পর থেকে সাতবানকে সবাই বেশ মাতব্বব বলে ভাবতে শুরু করেছে। মোরি এ কথাও বলেছে, তুই ছাড়া তো আমাদের নেতা বনবার মতো মানুষও নেই। তা তুই বনে যা হামানিকে লীডর। খাই, চাই না খাই, কামিয়া নেই, আমি এটা জেনে মরতে চাই।

—মৌসি, তুই এখন মরবি না।

—আর কতদিন বাঁচব?

—মৌসি, তুই মরলে আমি চবুতরা বানিয়ে দেব, ঔর মিটিন্ ভি করব।

—হাঁ হাঁ, চবুতরা বানাতে সিমেন্ লাগে, ইট লাগে, কত কি লাগে।

—মৌসি! ফরেস আর পি. ডবলু. ডি যত ফলক লাগিয়ে রেখেছে বনে পাহাড়ে, পথের ধারে, ধড়াধড় খুলে আনব আর গেঁথে দেব।

বাসনি বলে, যত কৌটো জমিয়েছে, তাতেই চবুতরা হয়ে যাবে।

টিনের ছোট ছোট কৌটোর ওপর মোরির দুরন্ত আকর্ষণ। কী সুবিধের জিনিসগুলো। জল খাও, চা খাও, চা করো, জল ধরে রাখো, একটু ছাতু বা লবণ ফেলে রাখো। এর কাছে ওর কাছে, মালিকদের ঘরে চেয়ে চেয়ে মোরি অনেক কৌটো জমিয়ে ফেলেছে। বাসনির নাতি-নাতনি তাতে হাত দিলেও বুড়ি ধুন্ধুমার কাণ্ড করে। যে মাচাঙে মোরি ঘুমোয়, তারই একপাশে কৌটোর পাহাড়। ঘুমোবার কালেও হাত দিয়ে দেখে, সবগুলো আছে কি না।

সাতবানকে সবাই মানে, তার আরেক কারণ, ও বিশালের দাদা।

বিশাল মরে গেছে বছর তিনেক। তা সবাই জানে। সাতবানের বউও মারা গেছে কবে। সাতবানের ঘব করত, সঙ্গে থাকত, তাতে অবাক হত না কেউ।

এটা খুব লক্ষ্য করার মতো বিষয়, যে সাতবান ও ঝালো কখনো তেমন কোনো আগ্রহ দেখায় নি। আর বিশালের জীবিত কালে দুই ভাইয়ে তেমন ভাব ছিল না। কিন্তু একদিন যখন খবর এল, যে বিশাল মরে গেছে—সাতবান কয়েকদিন পর থেকে বিশালের ছেলে মেয়ের খবব নিতে থাকল।

ঝালো অথবা, সোনার মা, অথবা গোহুমনি, এখনো এমন ডাঁটো আর শক্তসমর্থ, যে ওর সঙ্গে ওর ভাসুরের কোনো সম্পর্কই নেই, তা বিশ্বাস করাই কঠিন।

বিশালের ঘর মালিকের মামলাধীন জমিটির কিনারে। বস্তুত বিশালের ঘর দিয়েই কেচকির লাঠা টৌলির শুরু।

পলামুর অন্যান্য জায়গার মতো, অন্যান্য সমৃদ্ধ গ্রামের মতো কেচকি হল পথের ধারে। চুনকাম করা সারবার মাটির শক্তপোক্ত বাড়ি, বাহির-দেওয়ালে, গন্ধমাদন বহনরত মহাবীর, বুক চিরে রাম-সীতা দেখানো মহাবীর। রাম-সীতার পায়ের কাছে জোড়হাতে মহাবীর, দেবতা রূপে সিংহাসনে বসা মহাবীর, সমুদ্র লঙ্ঘনরত উড্ডীয়মান মহাবীর, এমন অনেক চিত্র।

বাড়িগুলির মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা, তাতে ছাগলের নাদি, মোষের গোময়। গোবর-ঘুঁটে-খড় বিচালির গন্ধ বাতাসে। বাড়ির অন্যদিকে মোটা মোটা ঘুঁটের চাবড়া।

উঠোনগুলিতে ধান ও গম শুকোয়, ইঁদারায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে জল তোলা হতে থাকে, ঘরগুলির জানালা অনেক উঁচুতে, যথেষ্ট ছোট। ঘরের দরজা, বাড়িতে ঢোকার দরজা খুব পুরু, পোক্ত, আলকাতরা মাখানো। কয়েকটি বাড়িতে শোবার ঘরে দেয়ালে বন্দুক আছে।

এমনি গ্রাম পলামুতে যথেষ্ট দেখা যায়। শ' তিনেক বছর ধরে পলামুতে রাজপুত ও ব্রাহ্মণ ও ভূমিহার জমি মালিকরা একভাবে বসবাস করছে। সাধারণত যেমন দেখা যায়, এখানে মালিকরা কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে জমিজমা দিয়ে বসত করিয়েছে। দেবতা ও ভক্তদের মধ্যে যেহেতু সরাসরি যোগাযোগ রাখা অসম্ভব, সেহেতু ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হয়ে থাকে।

কেচকি গ্রামের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের আনা আবশ্যিক ছিল। মালিকরা সবাই রাজপুত। কেচকিতে সেদিনও এরা ঘোড়া রাখত। এখন সাইকেল রাখে।

এই মকাই-গম-পানচাক্কি মহাবীরের ছবি-ঘুঁটের স্তূপ যেমন কেচকির এক রূপ, তেমনি তার আরেক চেহারাও আছে।

কেচকির মতো অন্যান্য গ্রামের এমন সব ঘর থেকেই এখন ঠিকাদারের অধীন ছোট ঠিকাদার, কখনো স্বাস্থ্যসেবক, কোনো প্রাথমিক শিক্ষক বেরোচ্ছে।

মেয়েদের পোশাকে নাইলন ও ছেলেদের ক্ষেত্রে রঙিন চশমা, প্রচণ্ড কেশসজ্জা, সিনথেটিক সুতোর শার্ট-প্যান্ট ও স্কুটারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ব্যাটারিচালিত ক্যাসেটরেকর্ডার, ক্যামেরা, এখন প্রচুর।

এ ভাবে টুকটাক করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বর্তমানে ভারত ঢুকছে পলামুর মানচিত্রের মধ্যযুগে। রাজনীতিক ব্যাপারটা মস্তানরা নিয়ন্ত্রণ করছে।

কেচকির ব্যাপারেও কিছু কিছু এমন ঘটনা ঘটেছে। মালিকদের ঘরে কেরোসিন স্টোভ দেখা যাচ্ছে। স্কুলে মালিকদের ছেলেরা থোড়াবহোত বেশি যাচ্ছে। জবরদস্ত ঠিকাদার বা মস্তান বা বেওসায়ী কেচকি এখনো তৈরি করতে পারে নি। তবে উকিল একজন হবে। সে পাটনায় আইন পড়ছে।

মালিকদের দুটি ছেলে বাড়ির তহবিল ভেঙে চিত্রতারকা হবার দুরাশায় বম্বে ঘুরে এসেছে। যদিও পুলিস তাদের ফিরিয়ে এনেছে, তবু তারা সাফল্যগর্বে গর্বিত। কেন না ফোটোস্টুডিওর সহায়তায় তারা চিত্রতারকাদের ছবির পাশে নিজেদের চেহারা বসিয়ে বেশ জমকালো কিছু ছবি নিয়ে ফিরেছে।

কেচকির দলীপ সিং ও রাজবংশ কেশরী সিং-এর পাশে অমিতাভ বচ্চন ও রতি অগ্নিহোত্রীর ছবি এখন ওদের বাড়িতে ঝোলে, দেয়ালে। পাশেই ক্যালেণ্ডার কেটে বাঁধানো মুলগাঁওকর অঙ্কিত রঘুপতিরাঘব ও গণেশ দেবতার ছবি।

দলীপ ও রাজবংশের বাবারা খুব গর্বিত। তারা থানা দারোগা, ব্লকবাবু, জঙ্গলবাবু, এমন সব মহান লোকদের ছবিগুলি সগর্বে

দেখায়। হাঁ, হাঁ, আমারই ছেলে। অমিতাভ বচ্চনের বহোত ভারি দোস্ত।

দারোগা বলে, হতেই হবে। আমগাছে ভালো আমই ফলে। নিমফল তো হয় না।

এটা কেচকির ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এটাও ঘটনা, যে কেচকির রাজপুতদের মধ্যে দহেজের কারণে বউকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারও ঘটেছে।

এখানে নয়, দিল্লিতে। গ্রামের সরপঞ্চ সমুন্দর সিংয়ের ইনজিনিয়ার জামাই দিল্লিতে এই কাজটি করেছে। পুলিশ কেস করেছে বলে সমুন্দর বড় ক্ষুন্ন। মেয়ে তো ফিরবে না আর। কেস করে ঘরের কেচ্ছা বাজারে ছড়িয়ে কী লাভ হবে?

আফশোস, বড় আফশোস এসব। আগে এ সব নিয়ে শোরগোল হত না। কেচকির জোতদার হিসেবে সমুন্দর সিং লাখ দুই খরচ করেছিল। সে তো শুধু জোতদার নয়, সরপঞ্চও বটে।

সব কিছুর পরেও বলতে হবে যে কেচকির রাজপুত মালিকরা রাজপুত হয়েও তেমন সুবিধে করতে পারছে না পলামুতে। পাবা উচিত ছিল, কেননা পলামুর "চাহে কাংরেস চাহে জনতা" দুটো রাজনীতিতেই রাজপুত জমিদাররা প্রচন্ড ক্ষমতাধারী।

কেচকির রাজপুতরা সবসুদ্ধ একত্রিশটি পরিবার। এদের যথোপযুক্ত রমরমা হচ্ছে না, তার কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অভাব।

বহুকাল ধরে জমিজমা নিয়ে এরা এ-ওর সঙ্গে যাচ্ছে। এ লড়াই কখনো দেওয়ানী, কখনো ফৌজদারী। এরা পারতপক্ষে ডালটনগঞ্জ যায় না। গেলে মামলা করতে যায় এবং আরো নতুন কেস ঢুকে দিয়ে আসে। টাউনে যায়, উকিলের ঘরে নিজ নিজ কেসের গাড়ি গাড়ি কাগজ আছে, এ কথা এরা সগৌরবে বলে থাকে।

এই সব মামলার কারণ হচ্ছে সাড়ে বাইশ একর জমি—যার পাঁচ একর টাঁড় ও বানঝারা এবং বাকিটা সরস। জমিটির সাড়ে সতেরো একরই হল সরস। ওখানে ভূপ্রকৃতি এমনই যে এই জমিটির আকার যেন গামলার গলদেশের মতো।

যেটুকু বৃষ্টি পড়ে, তার জল গড়িয়ে নামে। এ অঞ্চলে নাকি নয়া জরিপ হবে, বহু জমি চলে যাবে বনবিভাগের দখলে। সেখানে সমাজভিত্তিক বন সৃজন হবে। সে জন্যে খাল কাটা হবে। সিঁচাই খালের সুবিধা পেলে জমিটি আরো উর্বর হবে।

এই বিতর্কিত ও মামলাধীন জমির কারণে কেচকির মালিকরা বড় পিছিয়ে পড়ছে।

এটা পলামুর বৈশিষ্ট্য যে উচ্চবর্ণের লোকরা এককাট্টা হয়ে বসবাস করে। অন্যদের যতটা সম্ভব দূরে ঠেলে রাখে। ফলে লাঠা একটি টোলি, যা কেচকির মধ্যে পড়ছে।

লাঠা দূরে। সেখানে ভুঁইহার, দুসাদ তিনঘর রবিদাস আছে। পাহাড়াইয়ারা একসঙ্গে সাত ঘর। নাগেসিয়ারা সব সময়ে পাহাড়ের ঢালে ঘর বাঁধে। তিন ঘর নাগেসিয়া আছে ঢালে।

এই লাঠা টোলির শেষ যেখানে, বিতর্কিত জমির শুরু সেখানে। একই প্রান্তে বিশালের ঘর। বিশালের বিধবা গোহুমনি সেখানে সোনা ও দানীকে নিয়ে সপাটে সতেজে বাস করে। "গোহুমনি" নামটি সে বিশেষ একটি ঘটনার পর অর্জন করেছে।

সে ঘটনাটি কেচকির জগতে এমনই বড় ও গুরুত্বপূর্ণ, যে গোহুমনিকে আর কেউ চট করে ঘাঁটাতে যায় না।

গোহুমনি মানে মাদী গোখরো। কে ওই মেয়ের গায়ে হাত দেবে? ও কামড়ে দেবে। ওকে ঘাঁটানো আর সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকানো একই কথা।

অনেক মনে করে, যে গোহুমনি ওরকম খরখরে মেয়ে বলেই সাতদান ওকে ঘাঁটায় না।

এমন যে কেচকি গ্রাম, সেখানেই লক্ষ্মণ সিং সিকেদার এসে হাজির হয় একদিন। সরপঞ্চের কাছে তার আবেদন।

সরপঞ্চ খুব খুশি হয়। লক্ষ্মণ সিং সিকেদার যে আসবে, সে কথা তার ভকিল বলেছে। এ কথাও বলেছে যে, ওহি লক্ষ্মণ সিং থেকে কেচকিতে একটা বড কাজ হবে। রাজপুত মালিকদের মধ্যে একতা আসবে।

—কৈসে ?

—আরে ? এ কথা বুঝতে হলে তো আমাকে অনেক গোপন কথা ফাঁস করতে হয়।

—বলুন না।

—ভালো কথা। মেয়ের ব্যাপারে কেস কেমন চলছে তা কিছু জানেন ?

—না। জানতেও চাই না। আমার মেয়ে তো আর ফিরবে না। পরের ছেলেকে জেলে পাঠালে তো তাকে ফিরে পাব না।

—মেয়ের ব্যাপারে জামাইকে মাফ করতে পারছেন। জমির ব্যাপারে জ্ঞাতি বন্ধুকে ক্ষমা করতে পারছেন না ? ও জমির ব্যাপারে কোনো একজন জিতবে না।

—ভকিল সাব ? আপনি কায়স্থ লোক, রাজপুতের গোঁ বুঝবেন না। আমরা বহুতই লড়াকু জাতি। ইতিহাসে পড়ে নেবেন। পলাশীতে আমরা আদালতে লড়ে যাই, কখনো লড়াই ছাড়ি না। যে রাজপুত পরিবার জমিজমা রাখে, কিন্তু মামলা করে না, তাকে আমরা কাপুরুষ বলি।

—আপনাদের হিসাব আলাদা।

—কি যেন বলবেন বলছিলেন ?

—দেখুন, এখন আপনাকে বলছি, কিন্তু আপনার মাথায় কি ঢুকবে কিছু ?

—বলুন না।

—বনবিভাগে আমার আত্মীয়স্বজন সব ঠিকাদারি কাজে আছেন। ভগবানের কৃপায় তাঁরা রাঁচি, টাটা, ডালটনগঞ্জে সবাই দর্শনধারী বাড়ি বানিয়েছেন, ট্রাকের কারবারও আছে।

—সে তো জানি।

— মনোহর লালের নাম জানেন?

—খুব জানি।

—উনি তো আমার বোনের নন্দাই, ওঁর ঠিকাদার মহলে নামী লোক। ওঁরা রাখেন বনের খবর।

—কী খবর?

—বহোত দিনে সরকার বের করেছে খবর যে, আপনাদের ওদিকে অনেক জমি বনবিভাগ নিয়ে নেবে। আর জমি সিচাই করে ওখানে ফরেস নার্সারি প্লান্টেশান করবে। ওই জমিটাও তাতে যাবে।

—ক্ষতিপূরণ কে পাবে?

—দেখুন, এসব হতে হতে দুই-তিন বছর লাগবে। আপনারা সবাই কেন দখলদারি দাবি করছেন? মিটমাট করে নিন। তাহলে ক্ষতিপূরণও এসে যায়। সিচাইও আসে।

— মুশকিল সাব। প্লান্টেশন যদি হল, তবে সিঁচাই দিয়ে আমাদের লাভ?

—সিঁচাই যখন হবে তখন তো করাবে মনোহর লাল, আর সামনে রাখবে লক্ষ্মণ সিং ঠিকাদারকে। তখন আপনার জমি তো অনেক জল পাবে?

—অন্যরা মানবে?

—বুঝাতে থাকুন। লক্ষ্মণ সিং এখন ওদিকে যাবে। সরকারি লৌহ আকর খনিখাদানে লেবার চালান দেবে। লেবার তো আছে আপনার ওখানে।

—লাঠাতে কামিয়া বেশি। যাব কামিযা নয তারা যাবে।

—আছে তেমন ?

—হাঁ হাঁ, অনেক।

সমুন্দর সিং অন্যমনস্কভাবে বলে কামিয়াদের মধ্যে, আমার কথা বলতে পাবি...আমার কামিযাদেব মধ্যে যদি যেতে চায কেউ, তো যাবে।

—এটা তো আজীব বাত হল।

—আপনি বুঝবেন না। দিনকাল পালটে যাচ্ছে এখন...এ বছর তো জল নেই, চাযও নেই। কাজও কবাতে পাবছি না, তাতে লুকমা দিতে বহোত খবচ তের জনকে!

—আপনার তের জন ?

—হাঁ...তো কাজের ফিকিরে ওবা এদিক-ওদিক যাচ্ছে। সাতবান বলল, মালিক! সরকার তো ব্লক থেকে রিলিফ গেহ্যা বহোত দিচ্ছে। আপনি আনান না কিছু। আমবা খেয়ে বাঁচি। কাঠ কাটব, কাঠ বেচব, এতে তো চলছে না আর। কেমন খচড়াই তা দেখুন।

—কী, রিলিফ আপনি তুলে নিয়েছেন ?

—করে!

—আপনারা তো ওদের পয়জারে শায়েস্তা রাখেন বলে শুনতে পাই।

—ভকিলসাব! যা সব জায়গায় চলে, যাতে মালিকের ইজ্জত থাকে, তা তো কেচকিতে চলবে না। আমাদের মধ্যেই এ সে ওদেবকে তাতাচ্ছে। বাবার আমলে, আমার আমলেও আগে, কামিযাবা কখনো কথা বলতে সাহস পাযনি। এখন তো একতা নেই। একজন নাকাল হলে আরেকজন হাসবে। আব আমি যদি সাতবানকে জুতা পেটাই, তো আমার জাতভাই ওকে বুঝাবে যে, টাউনে যা, কেস করে দিয়ে আয়।

—হাঁ হাঁ, ও তো জানি।

— কুশল প্রসাদজি তো আপনার ভাগ্নে!

—হাঁ।

—তা উনি সব সময়ে বন্ধুয়াদের হয়ে মালিকের নামে কেস ঠোকেন কেন?

—আরে সমুন্দরবাজি! ছেলে খুব শানদার, ওর মনে থোড়াকহোত আইডিয়ালিজমও আছে। তাই গরিবের হয়ে লড়ছে!

—কী আছে বললেন?

—আদর্শ, আদর্শ।

—না না, এ ঠিক নয়। আপনি ওর আত্মীয়, আপনি তো ওকে বুঝাবেন যে উকিল হলে আদর্শ রাখা ঠিক নয়; তাতে মক্কেল ভেগে যাবে।

—করছে করুক না। বয়স কম, আদর্শ আছে অনেক। তারপর, আপনাকে বুঝানো খুবই মুশকিল! এমন কেস করলে ইজ্জত খুব বাড়ে। ওই যে মৌথাবনীর কোঁয়ার শাহী সিং দুটো কামিয়াকে ধরে ল্যাম্প জ্বালাচ্ছিল, সে কেস তো ওই করছে।

—ঠিক কাজ করছে না। উকিলের কাজ, বাজার কাজ। এই তো আপনি কতবড় বাড়ি করেছেন, গাড়ি কিনেছেন, ছেলেদের বোর্ডিঙে রেখে পড়াচ্ছেন! কুশল যা করছে... উকিল সাব! কেচকিতে রাজপুত মালিকদের একতা না থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই ছোট থেকে বড়, সবাই পলামু জিলা ভূম্যাধিকারী কল্যাণ সংঘের সদস্য আছি, চাঁদাও দিই।

—খুব ভারি সংস্থা।

—খুব। শাহী সিংহের নামে কেসের ব্যাপারে আমরা খুব চটে গেছি। আর কুশলপ্রসাদকে আমরা জিলা থেকে নিশ্চয় হটাব। ওকে তো কেস আমরা দেব না কখনো।

—ইজ্জতদার কেস করতে করতে ও নাম পেয়ে যাবে, দেখবেন।

—যা বুঝেন! আপনারা কায়স্থরা এত লেখাপড়া করছেন বলে বুদ্ধি ঠিক থাকছে না।

—সমুন্দরজি! জমি ভৈসা আর কামিয়া থেকে তো সকলের ফয়দা উঠবে না।

—এ কথাও ঠিক।

—লক্ষ্মণ সিংকে নিয়ে যান।

এমনি করেই লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদার কেচকিতে ঢোকে। তার দেহটি পাকানো, নাগরার শুঁড় পাকানো, গোঁফের ডগা পাকানো, দেখেই মৌরি বলল, এ লোকটা কে? দেখে মনে হয় খরাতাপে সিঁটকানো ভিণ্ডি একটা।

দেহশ অপুষ্ট ও শীর্ণ হলে যেমন ডগা পাকানো হয়, তেমন দেখতে—মৌরির মন্তব্য বেশ লাগসই হয়, সবাই হাসে।

লক্ষ্মণ সিং থাকল সমুন্দরের বাড়িতে। তারপর সমুন্দর, সরপঞ্চ হিসেবে লাঠা টোলিতে গেল বিকেলে। সরপঞ্চ হিসেবে সে সকলকে ডাকতে পারত। কিন্তু কেচকির বাতাস বর্তমানে খুব ঘোরালো।

নওনেহাল সিং, ভানুপ্রতাপ সিং, সমুন্দর সিং, সবাই জমিটির ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিপক্ষ।

কেচকিতে সমুন্দরকে সরপঞ্চ পদ থেকে সরাবার ব্যাপারে ওরা দুজন এক পক্ষ। নওনেহাল সরপঞ্চ হতে চায়। ভানুপ্রতাপ এখন মুখিয়া আছে, তখনো মুখিয়া থাকবে।

ভানুপ্রতাপও একদিন সরপঞ্চ হতে চাইবে নিশ্চয়। তখন নওনেহালের বিপক্ষে অন্যদের সঙ্গে জোট করবে।

ভানুপ্রতাপ অধৈর্য নয়, বোকাও নয়। সে জানে যে এ অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনা আসতে দু-চার বছর দেরি আছে। যখন আসবে, সেই সময়েই টাকা আসবে। তখন সরপঞ্চ হওয়া লাভজনক। এখন চুপচাপ থেকে যাওয়া ভালো।

সমুন্দর গ্রামে সকলকে ডাকলে নওনেহাল ও ভানুপ্রতাপ বলে বসতে পারে, যে সরপঞ্চ সকলকে রিলিফ দেবে বলে ডাকছে।

সত্যি বলতে কি মাত্রই একুশ হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা তুলেছিল সমুন্দর।

সবটাই ব্লকে বসে ম্যানেজ হয়। ভানুপ্রতাপ পাঁচ হাজার পেয়েছিল। অথচ তারপর থেকে সে আলগা আলগা ভাব দেখাচ্ছে, যে সমুন্দর খানিক চিন্তিত।

ভানুপ্রতাপ বলল, সরপঞ্চ রিলিফের টাকায় জামাইকে জমি কিনে দিয়েছে আর তোমাদের উপোসে শুকোচ্ছে।

তাতে খানিকটা হাওয়া দূষিত হল।

তারপর সবাই মিলে সরপঞ্চের নামে দুর্নীতির অভিযোগ আনল, কেস করল।

দরকার কি ঝামেলায় গিয়ে। সরপঞ্চ হিসেবে লাঠা টোলিতে গেলে ওরাও ধন্য হবে। হায়! গ্রামে কেন একতা নেই? ওই জমি কেন সমুন্দরের নয়? সবগুলো ব্যাপার যদি ভালোয় ভালোয় ভালোর দিকে যেত, তাহলে সমুন্দর কি কামিয়াদের এত বাড়তে দিত? যাক্, মহাবীরজি যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে।

লাঠা টোলিতে যাবার সময়ে সমুন্দর মাথায় টুপি পরল, হাতে লাঠি নিল। পুরনো আদবকায়দা সবচেয়ে ভালো। সমুন্দর পুরনো পোশাক ছাড়েনি। ধুতি, কুর্তা, পায়ে মুচির তৈরি মোটা নাগরা। এক জোড়া বালাও বহোত্ দিন পরে পরল।

নওনেহালরা বোঝে না। জমিজমা, ক্ষেতিবাড়ি করবে-তো প্যান্ট পরবে, শার্ট পরবে, সাইকেল চেপে ঘুরবে, এটা কি বেখাপ্পা লাগে না? আর কেমন সব কথা ছোকরাদের!

---বিজলি আনুন, বিজলি।

---ভৈয়া, কেন?

—বিজলি থেকে সিঁচাই চলবে।

—সিঁচাই!

—দেখুন সরপঞ্চজি, সব কথার জবাবে অমন বোকার মতন জবাব দেবেন না। বোকা তো আপনি নন।

—ভৈয়া...

—বিজলি তো উন্নয়নের জন্যেই চাই। বিজলি এলে স্যালো চলবে, ডি. টি. বসবে। সিঁচাই আসবে এলাকায়। বিজলি তো উন্নয়নের প্রধান উপায়।

—ভৈয়া, তোমরা যা বলছ তা মেনেও নিলাম। কিন্তু তবুও আমি বলব, ঔর জোর দিয়েই বলব যে, আমার দেশে পুরানা রীতিপ্রথার চাষবাস ভালোই চলে। তাতে অনেক বেশি লোক কাজ পায়!

নওনেহাল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ভারতবর্ষ এখন কত কিছু করছে, আর্যভট্ আকাশে যাচ্ছে, কপিলদেবরা কত বড় সম্মান আনল...আপনি দেখছি অঞ্চলকে সেই কেরোসিনের বাতি আর ভৈঁসা গাড়ির যুগেই রেখে দিতে চান।

ভানুপ্রতাপ এসব কথায় যোগ দেয় না কখনো। ও বোঝেনা যে সরপঞ্চ ও নওনেহাল বেকার উদাম খরচ করে কেন কথা বলে। বিজলি একটা বাস্তবতা। বিজলি আসছে। পথে যখন আছে, তখন কেচকিতেও আসছে। যা আজ না হোক, আগামী কাল হবেই হবে, তা নিয়ে বকবক করে উদাম খরচ করা বড়ই বোকামি।

সমুন্দর ও লক্ষ্মণ লাঠা টোলির দিকে চলে। ওই তো সেই বিতর্কিত ভূমিখণ্ড, যাকে নিয়ে কেচকির রাজপুত মালিকরা বিভক্ত হয়ে গেছে, মামলা করছে, নিজেদের সময় ও আয়ুক্ষয় করছে।

তবে এ কথা বলতেই হবে যে, গাই-ছাগল মোষ চরাবার পক্ষে এটি খুব ভালো জায়গা। মাঝে মাঝে বামন বামন পলাশ গাছও

আছে। কেচকির মালিকদের চরোয়াহা কামিয়ারা গাইছাগল চরাবার পক্ষে একটা ভালো জায়গা পেয়ে গেছে। অন্যান্য গ্রাম থেকে চরোয়াহারা আসত এখানে। এ নিয়ে অনেক ঝগড়াবিবাদ ছিল। তারপর এই এলাকা জুড়ে নিয়ম হয়ে গেছে যে, এইখানে গাইছাগল চরাতে পারো, সরপঞ্চকে কিছু পয়সা দিয়ে।

বর্ষার পর শরতে এই এলাকার বাতাসে হিম এসে যায়। তখন এই জমিতে জন্মায় বন বন কাশফুলের গাছ। কাশ, জিগড়া, ঝারি, এমন সব ঘাসে ও ঝোপঝাড়ে এ জায়গাটি ভরে ওঠে। কাশের ডাঁটি দিয়ে তো ঘরের বেড়া, গোহালের আগড় করে লাসার লোকেরা। সেজন্যে কাশের ঝোপগুলিকে যথেচ্ছ বড় ও বুড়ো হতে দেয়া হয়। ডাঁটা মোটা হলে তবেই তো আগড় ভালো হবে।

খুব উঁচু হয় ঝোপগুলো। আড়ালে মানুষ লুকাতে পারে, বাঘও। সমুন্দর নিজে যখন বালক ছিল, তখন ওখানকার কাশঝোপ থেকে বাঘ এসে লাসা টোলির লোকদের ছাগল-গরু নিয়ে যেত। ওই মাঠে ঘাসের ও কাশঝোপের আড়ালে বাঘ ঘুমোচ্ছিল। নওনেহালের ঠাকুর্দা শিকার করেছিল; সে খুব শিকারী ছিল, ঘোড়া চেপে জমিজমা দেখত, আর অনেক দেশ বেড়াত।

সমুন্দররা অত জানে না যে কোথায় দিকানির, কোথায় ভরতপুর, কোথা থেকে ওরা এসেছিল।

সে সবই জানত।

খুব উঁচু কাশের ঝোপ, মানুষ লুকাতে পারে। সমুন্দর মৃত বিশাল ভুঁইয়ার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এ গোলমনি! এ সোনাকে মৈয়া!

—কা, মালিক!

লাসা টোলিতে বিকেলের পড়ন্ত আলোতে অত্যন্ত ছোট একটি ঘরের সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি ধান ঝাড়ছে কুলোয়, সে হাতের কাজ থামায় না।

—সাতবান কোথায়?

—আমি জানি না। এ সোনা, তোর জেঠা কোথায় রে? দেখেছিস না কি তাকে?

বছর ছয়েকের একটি ছেলে তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী একটি ছাগলকে ঘরে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, জেঠা দোকানে গেল। ডেকে আনব?

সমুন্দর বলে, বলে দিস ঘরে যেতে।

—কেন মালিক?

—এহি লছমন বাবু ঠিকেদার। কাজের কথা বলবে।

—কী কাজ?

লক্ষ্মণ গোম্বমনিকে দু চোখে পান করছিল। কী কোমর! ময়লা, মোটা কাপড়ে ও জামায় ঢাকা শরীরের ওঠা নামা বা কি চোখ জুড়ানো। মেয়েটি তার দিকেই তাকায়। চোখের হিংস্রতা খুব পরিষ্কার।

—খনিখাদানে কাজ।

—সোনার জেঠা কী করবে, আমি বা কী করব? আমরা মালিকের কামিয়া।

সমুন্দর যেন এখানে দাঁড়াতে চায় না। সে বলে, এখন তো আমার কাছে কাজও নেই রে! দুই তিন মাস তোরা খুব পারবি বাইরে যেতে।

—তাকে বলো!

সমুন্দর অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে সুপুরি বের করে গালে দেয় ও বলে, খুব আকাল!

গোম্বমনি জবাব দেয় না। কাঁচা দু সের ধান তার প্রাপ্য লুকমা হিসেবে। সে ধান এমন কদর্য যে কুলোয় ঝেড়ে, তা বাদে কুটে তবে রাঁধতে হয়। সাতবান নিজের ভাগটিও নিয়ে আসছে তাই

যা রক্ষে। বনের কাঠ বেচে তেল-নুন কেনো। দোকানী কাঠ রেখে নেয়, সওদা দেয়।

সাতবানের ঘর অন্য প্রান্তে। সাতবান উঠোনে খাটিয়া পেতে দেয়, "মালিক পরোয়ার" বলে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে তাকে। এমন অনেক কিছুই করে, যাতে সমুন্দর মনে মনে খুশি হয়।

কথা শুনে সে বলে, এ তো খুব ভালো কথা মালিক! আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি সকলকে বুঝিয়ে বলব এখন। আপনি ঘরে চলে যান।

—একে আমার ঘরে পৌঁছে দিবি।

—নিশ্চয় দেব হুজুর।

— সকলকেই বলিস।

— হাঁ হাঁ, কামিয়া ঔর ন-কামিয়া।

— নাগেসিয়াদেরও বলিস।

—তা তো বলব হুজুর। কিন্তু অন্য মালিকরা যদি রেগে যান?

— তখন কামিয়ারা যার যার মালিকের কাছে হাত জোড়বে, বলবে যে, মালিক! এখন তো কাজ নেই। সবাই লুকমা দিতে পারছেন না! আমরা এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছি ঔর জঙ্গল ভরোসায় দিন চালাচ্ছি। কৃপা করে অনুমতি করুন, দুই তিন মাস কাজ করে আসি। ভালো করে বলবি, কাজ হবে।

—তা বলব মালিক!

—তোরাও টাউনের হাওয়া খাচ্ছিস, কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিস। তোদেরকে মাধো সিং খারোয়ার বুঝাচ্ছে, যে ভারত সরকার তোদের মুক্ত করে দিয়েছে। আরে বাবা! আমার কামিয়াদের তো আমি এখনি খালাস করে দিতে পারি। দেনেওয়ালা আমি, লেনেওয়ালা কোথায়!

হাঁ হুজুর।

—যত যত করজ জমে আছে, সব দিয়ে দিলেই তোরা খালাস হয়ে যাবি।

—কোথায় পাব মালিক?

—আরে! এ কথাটা বুঝলি না, যে ভারত সরকার তোদের খাওয়ায় না। মালিকরা খাওয়ায়। কামিয়ৌতি বন্ধ করবে, তোদের মুক্ত করবে, এসব কথা শুনতে খুব ভালো। কাজের বেলা?

সমুন্দর সিং নাগরা মসমসিয়ে চলে যায়। সাতবান বলে, বলুন হুজুর। আপনার কী সেবা আমরা গরিবরা সাধন করতে পারি?

—কেমন কাজ?

—ম্যাগনেটাইট খাদানে।

—সরকারি, চাই কংট্টা?

—দুরকমই।

—আমরা কত পাব? সরকারি রেট?

—ভৈয়া! মিছে বলব না। সরকারের রেট তো পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা। আমি তোমাদের সাফ কথা বলব। ওই রেট পায় পাক্কা মজুর।

—আপনি কাচ্চা মজুর খুঁজছেন?

—হ্যাঁ। আড়াই-তিন টাকা দেব রোজ।

—তাতে তো চাল হবে না এক সের।

—ভেবে দেখো।

মোরি খনখন করে বলে, ভাবলাম, দেখলাম। এখন তো জঙ্গলের কাঠ কেটে আমাদের চার টাকা হচ্ছে, ঔর তাতেও চলছে না।

সাতবান বলে, আমরা জানি যে এখানে কী হবে! তবে এখন তো লেবার-ঠিকেদার গ্রামে আসে। চাই ইটভাটা, চাই কয়লাখাদান, চাই অন্য কোনো কাজে লেবার খুঁজে। গরিবের নসিব! ঠিকেদাররা সরকারি রেটই উঠায়, ঔর গরিবকে দুই-চার টাকা দেয়।

—সে অন্যরা করতে পারে...

—আপনি তা করবে না...

—ধরো ওটা খানিক বাড়াতে পারি।

—বলব সকলকে।

আমি তো তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চাই। কেননা পরে এই এলাকাতেও কাজ হবে। তখন এলাকার লোকই নিতে চাই। এই সব কাজের জন্যে সম্পর্ক করা দরকার।

—হাঁ বাবু।

—আমি তো লাইসেন্ নিয়ে কারবার করি।

—হাঁ বাবু।

—তাহলে সকলকে বোলো।

—বলব, চলুন। পৌঁছে দিই।

লক্ষ্মণকে পৌঁছে দিয়ে এসে সাতবান বলে, বহোত হি সাঁসবাজ, ধান্ধাবাজ। বলে কী! বাবারা লাইসেন্ নিয়ে কারবার করছে ঔর চৌরি ইলাকায় জঙ্গলের আমলকি, হরর্তকি, শালপাতা, ইলাকা ইলাকায় ডিম ওর মুরগি, হাসপাতালে খাবার, সব ও লাইসেন্ নিয়ে চালান দেয়।

মোরি বলে, এখন চালান দিচ্ছে মানুষ।

—এ কাজে সবচেয়ে বেশি নাফা। মাথা পিছু কোম্পানি দিল ধরো পঁচিশ টাকা। এ তোমাকে দিল তিন টাকা। কোম্পানি বাবু, ইউনিয়ন, সবকে খাইয়ে তখন এর যদি পাঁচ টাকাও থাকে, আর লেবার থাকে একশো! তাহলে তো এ রোজ পাঁচশো টাকা পাচ্ছে। আরে, এর লেবার বিশটা থাকলেও রোজ একশো।

—হাঁ হাঁ, জরুর কোনো ধান্ধা আছে। সরপঞ্চ এনেছে যখন!

—সবাই খুঁজে কেমন করে গরিবকে সবচেয়ে কম দিয়ে লাগানো যায়।

—এর চেয়ে মালিকের মোষ হলেও ভালো ছিল। গরু আর মোষ তো খেতে পায়।

—মৌসি! গরু আর মেয়ের দাম কত হয় বলো? মানুষের তো দামই হয় না।

—তাও সত্যি।

—তবু বড়ো কষ্ট মানুষের। যে যেতে চায় সে যাবে। বলব সকলকে।

বাসনি বলল, যদি খেতে পাই, তাহলেই চলে যাব। একবার গেলে আর ফিরব না।

সাতবান বলে, এগুলো কোনো কাজের কথা হচ্ছে না। খালাস নিতে হবে, মদতও আদায় করতে হবে।

মোরি উপসংহারে বলে, এ লোকটা কে? দেখে মনে হয়, খরাতাপে শুকনো ভিণ্ডি একটা!

মন্তব্যটি খুব লাগসই হয়। সবাই হাসে। মোরি সগর্বে বাসনির দিকে তাকায়। দেখো! আমি এখনো শুধু কথা বলেই সকলকে হাসাতে পারি।

সমুন্দরের বাড়িতে রুটি, ডাল আচার ও বেগুনের ভাজি খেয়ে লক্ষ্মণ একটি বিড়ি ধরায়। না, বড়ই তৃপ্তি হয়েছে তার! এখানকার জলও ভালো, ডাকল বলেছে। সে বলেছে, কয়েকবার তোমাকে ব্যবস্থা করে দিলাম। কোনোটাই তুমি রাখতে পারছ না।

—এখানে সব ঠিক থাকবে।

—এখানে চেপে থাকো, ভালো থাকবে। কেচাঁকি গ্রামের জল খুব হজমি।

—কৈসে?

—হয়তো খনিজ কারণে। পলামুতে খনিজ সম্পদ অনেক। তবু কোনো শিল্প নেই। পলামু কৃষি জেলা হয়েই রয়ে গেল আজও।

—ইনডাসটি তো হোনাই চাহিয়ে।

—কেচকিতে যাও। ওখানে নহলাতে লাটা নদীর এক কুণ্ডী আছে। জল হজমি খুব। এক শিব মন্দিরও আছে। পুজারী জল বেচত, খুবই আশ্চর্য যে সে কুণ্ডী শুকিয়ে গেছে। আর পুরা কেচকির জল মিঠা হয়ে গেছে।

—চেহারা ফিরবে আমার?

—দেখো।

—আপনার বহোত দয়া আমার উপর।

—আরে ভৈয়া! যতদিন ঠিকাদারি করছ, এতদিনে তোমার রাজা হয়ে যাবার কথা। হতে তো পারছ না। ফরেসের মাল বলতে তুমি টৌরিতে বসে আঁওলা চালান দিতে থাকলে! আরে! টৌরি থেকে লাপরা এসো, দক্ষিণে যাও, বোরা বোরা আঁওলা তো জঙ্গলে মিলছে, পয়সাও লাগে না। না দেখলে শালগাছ, ওঃ!

লক্ষ্মণ এ কথায় বন উসখুস করে। দুই ঠিকেদার ঢুকেছিল টৌরি এলাকা। সুন্দরলাল ঠিকেদার লক্ষ্মণকে ভিড়িয়ে দেয় একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। সেই দুসাদিনকে নিয়ে লক্ষ্মণ থাকে ব্যস্ত এবং পাহাড় জঙ্গলে আমলকি বা আঁওলা তোলাতে থাকে মহাবীর আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে! আমলায় নাফা কম।

সুন্দরলাল নিজে লাপরা থেকে যাট-সত্তর বছরের পাকা শালগাছ কয়েক শত কেনে।

বিদায় বেলা আসে যখন, সুন্দরলাল মোটা টাকা, এবং লক্ষ্মণ জলভরা চোখ নিয়ে লাপরা ছাড়ে। ঘটনাটি এখনো যথেষ্ট মজা দেয় লোককে।

লেবার-চালান এখন খুব লাভজনক। সে জগতে ঢোকাই মুশকিল। ভকিলসাব লক্ষ্মণের জন্যে এখনো চেষ্টা করেন, কেননা ভকিলসাবের পত্নী এবং লক্ষ্মণের মা একই মঠে দীক্ষিত, একই

গুরুর কাছে। এই গুরু বর্তমানে পলামুর রাজনীতিক নেতারও গুরু।

লক্ষ্মণ এবার নতুন করে জীবন শুরু করবেই করবে! সমুন্দরকেও খুশি করে দেবে।

—হাঁ সুমুন্দরজি!

—বলুন।

—ওই মেয়ের নাম কি গোহমনি?

—না...আরো কোনো নাম আছে।

—তাহলে "গোহমনি" কেন বলা হচ্ছে?

—সে খুব উলটাপালটা কাহিনী।

—বলুন না।

—বলব...! অবশ্য বললেও হয়। কেচকিতে থাকলে, চাই যাওয়া আসা করলে আপনি কারো না কারো কাছে অনেক ঝুটামুটা বাত শুনবেন এ কথা নিয়ে। আমি যা জানি সেটাই সত্যি কথা। এ একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার, ঔর আমার ইজ্জতও যা খেয়েছে, অথচ মহাবীরজির কসম, দুর্গা মাইয়ের কসম, এতে আমার কোনো দোষ ছিল না।

এ কথা বলে সমুন্দর দেয়ালে প্রলম্বিত ছবিগুলির দিকে তাকায়। ঘরে হারিকেন জ্বলছে! তার আলো দেয়ালেও। সমুন্দর দেখতে চায় মা দুর্গা, বা দুর্গামাইয়া-বেশী ক্যালেণ্ডারের ছবি। কোনো বাস্তব কারণে ক্যালেণ্ডারের দুর্গামাইয়া এবং অতীতের অভিনেত্রী নিরূপা রায়ের মুখে অদ্ভুত সাদৃশ্য। কারণ ব্যাখ্যাসাধ্য। নিরূপা রায় একদা পৌরাণিক হিন্দি ছবিতে দুর্গামাইয়া, গঙ্গামাইয়া, কালীমাইয়া সাজতেন। ক্যালেণ্ডারের ছবি সেসব সিনেমার পোস্টার দেখেই আঁকা।

সমুন্দর দেখতে চায় দুর্গামাইয়ার ছবি! তার চোখ পড়ে রাজবংশ ও রতি অগ্নিহোত্রীর ছবির দিকে। রাজবংশ ও দলীপ, অমিতাভ

বচ্চন ও রতি অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে নিজেদের পাঞ্চ করা ছবি কেচকিতে কয়েকটি উপহারও দিয়েছিল।

ছবিটি সমুন্দরকে বড় বিচলিত করে। সে হারিকেনা দিয়ে রাখে, এবং ঝালো কেন গোহ্‌মনি হল, তার কাহিনী বলতে থাকে।

সবই মহাবীরজির ইচ্ছায় ঘটেছে।

বিশাল ভুঁইয়ার বউ ঝালো। বিশাল, ঝালো, বিশালের দাদা সাতবান, এরা একলেই সমুন্দরের কামিয়া। ওদেব ঠাকুদা সাতবানের বিয়ে দেবার জন্যে সমুন্দরের বাবার কাছে একষট্টি টাকা ও এক বোরা চাল নেয়। তখন এক মণ চালের দাম সাত টাকা।

এ ভাবেই ওরা কামিযা হয়ে গেল। কামিয়ৌতি তো খতম হয় না কখনো। তাই সাতবানের ঠাকুর্দা, সাতবানের বাবা, সাতবান ও বিশাল, ওদের বউরা, সবাই কামিযা হযে থেকে গেল।

বিগত বিশ-বাইশ বছরে ওরা অসুখে, আকালে, বিশালের বিয়েতে, বাপমাযের মৃত্যুতে, যত ধার নিয়েছে,—(এমন ধার ওরা নিয়েই থাকে) সবই যোগ হয়েছে সেই আদি করজের সঙ্গে।

ওই পরিবারটি উনিশশো একষট্টি সাল থেকে কত কি নিয়েছে, সব মনে আছে সমুন্দরেব।

সাতবানের বিযেতে একষট্টি টাকা আর এক বোরা চাল।

তারপর সাতবানের মায়ের শোথজ্বরে এগারো টাকা। তারপর পেটের ক্ষুধা মিটাতে আধ বোরা কুরথি কলাই। তারপর বিশালের বিয়েতে পঁচিশ টাকা। বাপের দাহ ও শ্রাদ্ধে একুনে বত্রিশ টাকা, আর মায়ের পারলৌকিকে ছেচল্লিশ টাকা।

বাইশ বছর ধরে বারবার ঋণ নিয়ে ওদের ধার এখন দাঁড়িয়েছে একশো পঁচাত্তর টাকা, এক বোরা চাল ও আধ বোরা কুরথি কলাই।

পরিমাণটা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বেড়ে বেড়ে এখন তিনহাজার টাকায় পৌঁছেছে।

যতবার ধার নিয়েছে, ততবার ওরা টিপছাপ দিয়েছে। ফলে এখন কতকাল যে ওদের দাস হয়ে থাকতে হবে তা বলা কঠিন।

বছর চারেক আগে বিশাল খুব গোল পাকাবার মতলবে ছিল। বিশাল বরাবরই খুব তেজী, খুব পরিশ্রমী, আবার মেজাজটাও খুব কড়া।

বউকে পিটাত। সমুন্দরও কত সময়ে বলেছে, দেখো বিশাল! রাবণরাজা মন্দোদরীকে পিটাতেন। তাতেই তাঁর পতন হয়েছিল। কাহিনী এখানে পৌঁছলে লক্ষ্মণ বাধা দেয় মহোৎসাহে। কেন না ঠিকাদারী কাজে ঘুরতে ঘুরতে সে তেমন ধনদৌলত করতে পারে নি, কিন্তু রামায়ণ খুব পড়েছে!

—হাঁ হাঁ, কেমন কথা বললেন রাবণ রাজা মন্দোদরীকে মারতেন? একথা কোথায় লিখা আছে?

—বলবন্ত দ্বিবেদীর লিখা রামায়ণে।

—এ কথা কেউ লেখে নি।

—কে লিখবে? কে জানে? পলামুতে হাটবাজারে ওর লেখা রামায়ণ বিক্রি হয়।

—ওঁর নামও শুনি নি কখনো।

—উনি খুব উঁচা দরের মানুষ ছিলেন। ওঁর পূর্বপুরুষ লঙ্কায় রাবণরাজার গৃহদেবতার পূজক ছিলেন। তাই অনেক কথা ওঁর রামায়ণে পাবেন, যা বাল্মীকিও জানতেন না। রাবণরাজা তাঁর রানীকে পিটাতেন। এই রামায়ণ পড়লে এ কথাও জানবেন, যে সীতামৈয়া রামচন্দ্রজির জন্যে বনবাসের কালে ঠিকসে খানাউনা পাকাতেন না বলে তাঁর এত লাঞ্ছনা হয়। এসব কথা সবাই জানে না।

—খুবই তাজ্জবের বাত।

—নিশ্চয়। বলবন্তজিকে দেখলে আপনি কী ভাবতেন কে জানে!

টিউকল বসাবার ঠিকাদার, কাটা কাপড়ের দোকান, বলবন্ত দন্তমঞ্জন প্রস্তুতকারক,—এ লোকই রামচন্দ্রজি, রাবণরাজা, সকলের খবর জানতেন। এটা খুবই আফশোসের কথা, যে নিজের বউকে পিটাতে গিয়ে উনি পা পিছলে পড়ে গেলেন, মরেও গেলেন।

—যাহোক, বলুন! মরে যাবার কথা কে বলতে পারে যে কার মরণ কেমন ভাবে হবে।

—তাও বলা যায় ঠিকেদারজি! আমার মরণ হবে সাপ কেটে, গণক বলেছেন।

—রাখুন তো ওসব কথা!

— যা বলছিলাম...আমিই সর্বনাশ করলাম। বিশালকে পাঠালাম সেমরা। বিহার মিনারাল ডেভলপমেন্ কর্পোরেশানের খাদানে আমার শালার কাছে। সে ওখানে ওভারসিয়ার। ঘর থেকে কিছু পাঠাবার ছিল।

—ওটা চলছে তো?

—খুব চালছে। ঠিকেদারেব লেবারও নিচ্ছে। একশো দরকার তো চারশো বসে থাকছে হাত জোড করে। আপনাকে লাইন করে দেব। আমি পিছনে থাকব, কিন্তু শেযার নিব। লেবার যাতে পান, তাও দেখব।

—নিশ্চয। তারপর?

—বিশাল তো বহোত খচডাই। চলে গেল সেমরা বন্ধুযাটোলি। সেমরার কামিয়াদের সঙ্গে অনেক জোতানানা করল।

ওহি সেমরায় সরকার কামিয়াদের খালাসও করে, মদতও দেয়। সেই থেকে মচ্ছর যেমন ভনভন করে, তেমনি বন্ধুযা লোকও গুন্‌গুন্ শুরু করছে যে, কামিযৌতে নেহি চলে গা।

—কৈসে ন চলে গা? পলামু জিলায় তো সিরিফ কামিযৌতিই চলে।

—ভৈয়া! ভারত সরকার তো জাতপাতের মহিমা বুঝে না। কামিয়ৌতি উঠাচ্ছ কেন? উঁচা জাত কি হাতে লাঙল ধরবে, না বিহার সরকারের রেটে মজুরি দিয়ে চাষবাস করাবে?

—সেই তো কথা!

—বিশাল ফিরে এসে যে কত রকম খচড়াই জুড়ল তা বলতে পারি না। টাউনে যায় আসে। কুশলপ্রসাদ ভকিলের কাছে বুদ্ধি নেয়।

—তাকে আমি জানি।

—নওনেহাল তা কামিয়া মেয়েকে পিটাচ্ছে, তাতে তোমার কী? বিশাল যেয়ে নওনেহালের হাত মুচড়ে ধরল। বুঝুন!

—তারপর?

—সকলকে নিয়ে এক কাট্টা হয়ে গেল। বলল, কামিয়ৌতি তো বেআইনি। বেআইনি খাটাবে, আওরত পিটাবে, তা হবে না। এ নিয়ে বহোত ঝামেলা উঠে। শেষে কুশলপ্রসাদের কাছে সেই আওরতকে নিয়ে গিয়ে কেসও করাল।

—আপনি কী করলেন?

—কী করব? কামিয়ার এমন আস্পর্ধা। আমাদের মধ্যে একতা থাকলে নওনেহালের জন্যে আমি লড়ে যেতাম। একতা একেবারে নেই! আর ওই যে জমির মামলা চলছে, যার যার কামিয়া তার তার সাক্ষী।

—ওখানেই মিটে গেল?

—হ্যাঁ, তখনকার মতো। তারপর বিশালকে বুঝালাম যে এরকম করা ঠিক নয়। ওকে যখন বোঝাব কি শাসন করব, ও তখন বলবে, হাঁ হাঁ মালিক। তুমি যা বলছ তাই ঠিক। তারপরই বিগড়ে যাবে।

—তারপর?

—মেয়েকে দেখতে গারোয়া গেলাম। ফিরে এসে দেখি বিশাল

নেই। কোন্ ঠিকেদারের সঙ্গে কথা বলে ওই সেমরার ওই খাদানে কাজ করতে গেছে গ্রাম থেকে চারটে কামিয়াকে নিয়ে।

—খুব তাজ্জব! সাহস হল কোথা থেকে?

—ঘরের মধ্যে বিভীষণ। ওখানে লেবার ঝামেলা হল। তাতে আমার শালাই ওকে রেখে নিল। বলছি না যে, রাজপুত জাতের মধ্যে একতা নেই?

—আপনি কী করলেন?

—থানায় খবর দিয়ে ধরে আনালাম। কিন্তু দারোগা তো আদিবাসী। মুণ্ডা, তাতে ক্রীশ্চান। সে বলল, কামিয়া প্রথাই বেআইনি। জবরদস্তি আপনি কাউকে গোলাম খাটাতে পারেন না। সেখানেও ইজ্জত চলে গেল। শেষে ব্লক অফিসার থানায় বলে....

—সে দোষ মানল?

—মোটেই না। আমার কাছে খুব চুপ করে থাকল। তারপর একশো টাকা করজ নিল। এ ক-শো টা—কা! কা খচড়াই রে বিশাল! সে টাকা নিয়ে রাতে পালাল কেচকি ছেড়ে।

—কোথায়?

—ধানবাদ কয়লা খাদানে।

—সেই কাজই করছে?

—এবার ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয় হয়ে গেল। কাজ করতে ভেগে গেল, তার তিন মাস বাদে খবর এল, যে খাদান ইলাকায় কোনো রাস্তা বানাবার জন্যে মাটি কাটতে কাটতে মাটির ধস নেমে অনেক লোক মরেছে। বিশালও মরে গেছে।

—মরে গেছে!

—হাঁ জি।

—আপনি কী করলেন?

—দেওতা বনে গেলাম। মহাবীরজির ইচ্ছা সবই। ওর বউকে

তাড়ালাম না। সেই একশো টাকা তো বিশাল নিয়ে ভেগে যায়। ওকে যদি কিছু দিয়েও থাকে, ওর বউ তা মানল না। সে বলে, যে টিপসহি দিয়ে টাকা নিল তার খাটার কথা। আমি টিপসহি দিলাম না, টাকা নিলাম না, আমি খাটব কেন?

—এও এক কথা।

—সবই মেনে নিলাম।

—গোহুমনি আপনার কামিয়া?

—কামিয়া তো ও ছিল, রয়েও গেছে। কিন্তু তখন ওর নাম গোহুমনি হল না। পরে....আন্দাজ আড়াই বছর আগে আমাদের মামলার কারণেই কেচকিতে সরকারি জরিপ তাঁবু পড়ল।

—হাঁ হাঁ, জমির কথা শুনেছি।

—আমিনবাবু এক সৃষ্টিছাড়া লোক। জমি জরিপ পার্টি এলে মালিকরা তাদের চাল-খাসি-ঘি পাঠাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঔরতও চাইলে ভেজবে, ওহি কামিয়া-ঘর থেকে। এটা কোনো ভালো নিয়ম নয়, কিন্তু পুরনো আদত, চলছে।

—নয়া আদতও তাই।

—এ আমিনবাবু তো এত বোকা, যে কোনো কিছু নেয় না, মাইনে ওই যৎ-সামান্য। তার উপর খুবই খিচখিচা মানুষ। এসেই বলে দিল, চাল-ডাল-আটা কাউকে বিনাপয়সায় দেবেন না। যা দরকার সব কিনে নেব, হিসাব দেবেন।

—সৎলোক খুব।

—ভৈয়া! তাতেই গণ্ডগোল বাধে জানলেন? সাচ্চা লোক, ঘুষ খায় না, এ রকম বড় অফসর দুটো একটা দেখেছি। কিন্তু নিচু মহলে এত কট্টর বামনাই না আমি দেখেছি, না আর কেউ দেখেছে। বিহারে তো এমন আদত চলে না, ঔর পলামুতে কখনোই চলে না।

—তারপর ?

—এ নিয়ে ওদের পিওন, চেনপিওন, কানুনগো, সকলের মধ্যে খুব অসন্তোষ ছিল। তশীলদারও এসেছিল। সে পলামুবাসী পাঞ্জাবী। তাব রোখ খুব। সে মেয়েদের লালচ খুব করে। তা ঝালোকে দেখে ও ক্ষেপে যায়।

—হাঁ। খুবই সুন্দরী।

—ওহি জমিতে তো ওরা লোটা নিযে যায। ঝালোও গিয়েছিল। তশীলদার কাশঝোপেব পিছন থেকে দেখছিল, সে ওকে জড়িয়ে ধরে।

—তারপর ?

—বাস! ঝালো তো চেঁচিযে উঠল, আর খুবই ঝটাপটি হল। শেযে ঝালো ওর হাতে দাঁত বসিযে দেয বাঘেব মতো। তখন তো বহোত গোলমাল বেধে গেল। ঝালোকে শিক্ষা দিবার জন্যে আমি তৈবি হলাম। ওদের জাতে মেয়েদের তো এত ইজ্জত থাকে না।

—কোথায তার থাকে ?

—ঝালো আমিনবাবুর কাছে বিচাব চাইল। হ্যাঁ সে এক দৃশ্য বটে। ঝালো কাঁদতে কাঁদতে এল আর বলল, পথের কুত্তীরও যদি কখনো ছুটি মিলে, তবু আমাদেব মিলে না। মালিকরা তো আমাদের বিনি পযসার বেগুী করেই রেখেছে। ঔর তোমার সরকারি তশীলদার, একে কোন্ শাস্তি দেবে ? ওঃ বাপ্‌রে বাপ! কী কাণ্ড!

হাতে কামড়ে দিল ?

—সে তো তখন হাতে ব্যাথায় কাঁদছে।

—তারপর ?

—আমিনবাবু ওকে মা! বোন! বেটি! বলে যতই মানায়, ও ততই বলে, মা-বোন-বেটি! তোমার মা-বোন-বেটিকে এমন বেইজ্জত করলে যেমন শাস্তি দিতে, তেমন দিতে পারবে ? অপরাধী

তো একদম চুপ, গুংগা যেন। চুপটি কবে বসে থাকল। বেশ একটা গোল পেকেছে দেখে কামিযা লোকও জুটে গেল। বহোত তামাশা লেগে গেল।

—বাপ বে! এক ভূঁইনকে নিযে?

—ভৈযা! পলামুব হাওযা এখন পালটাচ্ছে। গবিব মেযে বলাৎকাব হলে সে কেসও হচ্ছে। আগে এসব হত না। কেউ সাহস কবত না ঝামেলা উঠাতে।

—এখনো তো হয।

—হয, হচ্ছে, এ তো ইলাকাব নিযম। কিন্তু আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে সব।

—তাবপব?

—আমি তো সবপঞ্চ। আমাকেই সাতবানবা বলল, যে এমন অন্যাযেব বিচাব আপনিও করুন। মেযেদেব উপব বেইজ্জতি যদি চলতে থাকে, তাহলে মাবদাঙ্গা কবে মানুষ ভেগে যাবে ইধাবউধাব। গবিবেব তো ভকিল-উকিল, আদালত পুলিশে কোনো বিশ্বাস নেই। মাবপিটাবে, ভেগে যাবে। আব এও খুব তাজ্জব, যে আমবা অছুত, আমাদেব ছোঁযা পানি অছুত, লেকিন আমাদেব আওবতবা অছুত নয।

—এখন এসব কথা হাওযায চলছে।

—আগেকাব দিন হলে ঝালোব মাথা নেড়া কবে টাউনে পাঠিযে দিতাম বেশ্ৰী টোলিতে। উঁচাজাতেব বাবু তোকে লালচ কবেছ তো ধন্য কবে দিযেছে একেবাবে। তা নিযে আবাব কথা? কিন্তু এখন তো উলটা বাতাস বইছে। তাতেই আমিও বললাম, যে বিচাব হোক।

—বিচাব হল?

— খুব। আমিনবাবু ওই তশীলদাবকে বহোত হি ডেঁটে দাবড়ে ফেবত পাঠাল। ক্যাম্পও তুলে নিল। আব যাবাব কালে সকলেব

সামনে ঝালোর মাথায় হাত দিয়ে বলল, মা! সতীত্ব রক্ষার জন্যে তুমি আজ যে কাজ করলে, সে তো অখবরে ছাপাই হবে, সরকার তোমায় পুরস্কার দেবে,—এমনটা অন্য রাজ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু পলামু বহোত অভিশপ্ত ভূমি। এখানে ভালো কাজ দেখালে খুন হতে হয়। ঔর চোর—চোট্টা—দাগাবাজ—ফরাবাজ—ধাপ্পাবাজ— বলাৎকারী—হত্যাকারী, সকলের মিলে নাফা সে নাফা, সৎনাম সে সৎনাম। তবুও মৈয়া, তোমাকে দেখে আমার বুক অনেক বড় হয়ে গেছে। চোরবাটেরা তোমার ইজ্জত লুটতে এসেছিল। গোহুমনির মতো ফুঁসে তাকে কেটে দিয়েছ।

—ওহিসে গোহুমনি!

—ওহিসে গোহুমনি।

আমিনের কাছে তখন কেঁদেকেটে পড়েছিল গোহুমনি। এ গ্রামের হালচাল জান না বাবা। আমাকে এখন মালিক লোকরা কত লাঞ্ছনা করবে, কাজ দেবে না। যার দৌলতে কপালে সিঁদুর আর হাতে কাচের চুড়ি পরতাম, সে তো নেই। দুটো সন্তান নিয়ে আমি তো হাওয়ার মুখে তুষের মতো উড়ে যাব কোথায়!

সরপঞ্চকে তখন মনের রাগ বুকে চাপতে হয়েছিল। বলতে হয়েছিল, না, না, কাজ তুই পাবি।

আর ওই বোকা তশীলদারকে গুনে গুনে পঁচিশ টাকা দিতে হয়েছিল। যাবার কালে আমিন বলে যায়, তোমাদের যাব যা অভিযোগ আমার কাছে গিয়ে বলবে।

একজন দুজন ভালো লোক এখনো প্রশাসনে আছে। আমি তাদের কাছে ভেজে দেব।

ওই এক বোকা তশীলদারের জন্যে নানা রকম বিপদ ঘটে গেল যাকে বলে। এতকাল ধরে মালিকরা, বাবুরা, পুলিশ, পিওন, ঠিকেদার, মস্তান, ট্রাকচালক, জঙ্গলরক্ষী, সকলেই কামিয়া ও অন্য গরীব মেয়েদের যথেচ্ছ ভোগ করেছে।

ভোগ করেছে, বেচে দিয়েছে, রেণ্ডী করে দিয়েছে, কত রকমই না করেছে।

ওদের ধরে নিয়ে পেড়ে ফেলার পক্ষে মলত্যাগের পরের সময়টি ছিল উপযোগী।

এখন কেচকি গ্রামের ঘটনার পর সবাই বেশ চমকে গেল। গোম্হমনি যদি পারে, তাহলে আমরাও বাধা দিতে পাবব সাহসে কুলালে। এবং গোম্হমনির বেলা যদি ক্ষতিপূরণ পঁচিশ টাকা হযে থাকে, তাহলে যত মেযে নিয়ত ধর্ষিত হয়, তারাও তো কামাই করে পঁচিশ টাকা করে।

সকলেই এ নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং এই নবচেতনার ভগীরথ গোম্হমনিকে বলে, চল্! সবাই একটু আনন্দ করি।

—কৈসে ?

—চল্, মদ খাই একটু করে।

—ছি ছি! আজ মালিকরা খুব বেশি অপমান হয়েছে। আজ বরং সাবধানে থাকার কথা। রাতবিরেতে কোনো চোটও উঠাতে পারে।

বাসনি ঝরঝর করে কাঁদে ঘরে এসে। মার কাছে বসে কাঁদে।

—হায় মা! হায় মা! একবার ধরম নিলে পঁচিশ টাকা যদি হয়, তাহলে সরপঞ্চের কাছে আমার এক মাসে দশ পনেরো বার পঁচিশ টাকা পাওনা হয়। আর নওনেহালের ঠাকুর্দার কাছে তোর পাওনা হয়—

চুপ কর্, চুপ কব্, কে কোথায় শুনবে! তখন সত্যনাশ হবে, সর্বনাশ হবে।

—না মৈয়া! চুপ করতে বলিস না।

সাহস করে ঝালো রুখে দাঁড়াল তো বড় কাজ করেছে। আমাদের

ইজ্জতও বেড়ে গেল। মালিকবা তো এও মানে না যে ঘরে আমাদের ছেলেমেয়ে আছে কি না। রেণ্ডীকাজে পয়সা মিলে এ তো তেমন হল না। এ তো জরিমানা আদায় করল ঝালো! এ টাকায় ইমান আছে, না কি বলো?

—কাঁদিস না অমন করে। নে, বিড়ি খা।

মোরি তার টিনের কৌটোর সাম্রাজ্য হাতড়ে হাতড়ে বিড়ি বের করে, মেয়েকে দেয়। তারপর বলে, আয়! তোর উকুন চারটি বেছে দেই। তুই আমার উকুন পরে বেছে দিস।

—হাঁ, দিই! হাট থেকে উকুন মারা ওষুধ আনব। সবচেয়ে ভালো তাই।

ঝালো, যে নাকি বিশালকে বহু, সোনাকে মৈয়া, সে কেমন করে গোহমনি হল, সে কাহিনী সবিস্তারে বলে সমুন্দর।

উপসংহারে বলে, ওর ব্যাপারে আমার তো এমন বেইজ্জত হয়েছে যে, ও যদি চলে যায় কাজ করতে, তাহলে আমি বাঁচি।

—স্বামী তো নেই।

—না।

—আর বিয়ে করতে পারে?

—খুব পারে। করছে কোথায়? দেখুন না! আমাদের সমাজে কোনো একতা নেই বলে এমন হচ্ছে। একতা থাকলে এক মালিকের অপমানে শোধ নিতে সকল মালিক রুখে যেত।

—সরপঞ্চজি! লেবার তো মেলা খুব দরকার। দেখুন না আশেপাশে ম্যাগনেটাইট লৌহ আকর খনি কতগুলো। রুংটা, বি.এম.ডি.সি. বি.সি.সি.এল. সবাই চালাচ্ছে।

—নাফা থাকে?

—নাফা না থাকলে চালাচ্ছে?

—তাও তো বটে।

—রেটও অনেক। একশো কিউবিক ফুট হিসাবে মজুরি হল, নরম মাটি কাটলে পঁচিশ টাকা ষোল পয়সা। নরম পাথর কাটলে একত্রিশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা। শক্ত পাথরে ছেচল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

—এ তো অনেক।

—পার্মেন্ট লেবার তো নেই কোথাও। থাকলেও যৎসামান্য। কাজ করবে বদলি লেবার। তার মধ্যে বাচ্চা ছেলেও অনেক ঢুকাব। সরকারি রেটে কোম্পানি দিবে। কেননা কোম্পানির লোকজন, ইউনিয়ন, সবাই বাট্টা পাবে। আমার নাফাও থাকবে।

—এরা কী পাবে?

—দুই থেকে পাঁচ। এদেরকে দশ-পনেরো দিলে আমাদের কিছু থাকবে না।

—এরা যায় তো ভালো। নয় তো লেবার আপনি কতই পাবেন। একে গরিব, তাতে খরায় সব জ্বলে আছে।

—কামিয়া লোক নিলে এই সুবিধা যে ওরা ভাগতে পাবে না, ভয় পায়। নইলে এখন চারদিকে যত ঠিকেদার ঘুরছে, বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পাবে তো ফুটা পয়সা, কিন্তু বড় বড় কথা শুনে চলে যাচ্ছে। খুব কষ্টে থাকে, খেতে পেলেও ভালো।

—খুব জানি। ভাদ্র মাসে চলে আসবে যত দালাল। মাথার চুল থেকে উকুন কি দেখা যায়? এরাও তেমন লুকিয়ে পলামুতে ছড়িয়ে পড়ে। খুব খানাপিনা করাবে, লোভ দেখাবে, আগাম টাকা দিবে। তারপর কালীপূজা দিওয়ালির পর পরব-পূজা সেরে সব ভাগবে পাটনা-ছাপরা-আরা-কলকাতা।

—কামিয়া লোকও ভাগে?

—তাও ভাগে। ওদের তো ধরমবোধ নেই যে আমি মালিকের বাঁধা গুলাম!

---না না, আমি দেখছি। আপনিও কোসিস করুন। আপনার কোনো খরচ নেই, যা হয় তাই নাফা।

---কামিয়ৌতি তো ওহি কারবারই ছিল।

---এখনতো আছে।

---থাকতে পারত। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো একতা নেই বলে এত ঝামেলা।

সমুন্দর কথা বলে চলে যায়। লক্ষ্মণকে বড় উতলা করে রেখে যায়। ধানবাদের কাছে মাটি কাটা ! মাটির পাঁজা ধসে অনেক লেবার মরে গেল। সব এখান-ওখান থেকে আনা ছুটা লেবার ছিল।

এই একটা কাজের জন্যেই তার বদনাম হয়ে গেছে অনেক। একথা ভকিলসাব একবারও উল্লেখ করে নি। কিন্তু ঘটনাটি সবসময়েই দুজনের মনেই ছিল।

মাটিকাটা কাজ ছিল। লাভ তো মাটিতে। আধঘণ্টা খাটবে, আর একশো কিউবিক ফিট চৌকা কাটলে সেই হিসেবে বাইশ টাকা মজুরি।

এখন ভারতভূমে এমন ছুটা ফুরনবাঁধা মজুর লোকের কোনো হিসাব নেই। কাজ হবে খবব পেলেই সব চলে আসে। সবাই জানে, যে আটঘণ্টা কেন, বারো-চোদ্দ ঘণ্টা খাটতে হবে। সবাই এও জানে যে হাতে পাবে সামান্য। খোরাকি পাবে। তারপর ঠিকেদার বলবে যে, তোরা বাইশ টাকা তো রোজ পেটে খেয়েছিস। যা, দশ পনেরো টাকা দয়া করে দিচ্ছি।

এভাবে ঠকবে জেনেও ওরা, রাঁচি, হাজারিবাগে, সাঁওতাল পরগনা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পলামু থেকে আসে। আসে, যায়,- আসে, যায়- মানুষের হিসাব নেই কোনো।

তো খুব কম সময়ে অনেক মাটি কাটবার ছিল। তখন লক্ষ্মণ মাটির পাঁজার পিছনে বাঁশ পুঁতে দেয়। বাঁশের আগে রুমালে মুড়ে একশো টাকার নোট বেঁধে দেয়। ওই বাঁশ অবধি মাটির পাঁজা উঠাও, আর যাদের হিম্মতে হবে তারা নোট জিতে নাও।

মাটি কাটা হচ্ছে, রেজা ও বালকরা উঠাচ্ছে, ফেলছে। সে লোকটা, নাম তার বিশালই তো, সে বলে, নেহি হোগা।

—কা নেহি হোগা ?

ঠিকেদারকে উপেক্ষা করে মজুরদেরকে বিশাল বলেছিল, ঠিকেদার চল্লিশ মজুর লাগিয়েছে। মাথা পিছু খরচ করছে পাঁচ টাকা। ওর থাকছে সতেরো টাকা। তা ওভারসিয়ার পাচ্ছে পাঁচ টাকা। ওর থাকছে বারো টাকা। ভৈয়া। বহ্নো। আমাদের রোজানি হয় আটশো আশি টাকা। ওভারসিয়ার পায় দুইশো, ও পায় চারশো আশি একেক দিন।

—হাঁ হাঁ, তাই তো পায়।

—এখন নোট বেঁধে লোভাচ্ছে। ভৈয়া, ইধার বনি গাহারা খাদ, উধার বনি নরম গিলা মাটির পাহাড়। এ কাজ সুস্তির কাজ, ব্যস্তির নয়। টাকা তুলতে আমরা ব্যস্তি হয়ে যাব তো মাটির ধস নেমে যবে।

—ঝুট !

ঠিকেদার ধমকে বলেছিল। আর সেদিনই সে কুলীধাওড়ায় অনেক মদ পাঠায়। সকলকে বলে, বিশাল ভয় দেখাচ্ছে। ওর কথা মেনো না। হিম্মতসে এ কাম খতম করো। ট্রাকে তুলে নিয়ে যাব চামসাড়ি। সেখানে পথ বানাবে। আমাকে ধরেছ তো কাজের অভাব হবে না।

কুলীধাওড়ায় এ নিয়ে খুব জল্পনা হয়। বড় অভাবে এসেছি। জানোয়ারের মতো ঝোপাড়িতে থাকছি, আর ভাত পিঁয়াজ খাচ্ছি। একশো টাকা পেলে ঠিকেদারের কাছে আরো চাঁদা নেব, তারপর মাংস ভাত খাব।

—তোরা মরবি।

—না বিশাল, ''না'' বলিস না।

—পুরা হিসাব রাখছি' আমি, ঠিকেদারের কাছ থেকে পুরা হিসাব নিব।

কেচকির যুবকরা বলেছিল, বিশাল পারবে। ও কাউকে ভয় পায় না।

—হিসাব নিয়ে ভেগে যাব।

ঠিকেদার বলেছিল, গেলেই হল? আমার কাছে ও তিনমাস কাজ করবে, চুক্তি হয়েছে।

এ কথা শুনে বিশাল বলেছিল, এ খুবই তাজ্জব বাত। মালিকও বলে তুই টিপসহি দিয়েছিস, বাঁধা আছিস। তুমি বলো, আমি টিপসহি দিয়েছি, বাঁধা আছি। বিশাল ভুঁইয়ার তো কিছুই নেই। না জমি, না নিজের ঘর,— তাকে কেন করজেশর্তে বেঁধে ফেলছ সবাই? এ কেমন ধান্ধা তোমাদের? তোমার শর্ত-টর্ত মানি না আমি। ভেগে গেলে করতে পার কিছু?

এই লেবার দল ছিল খুব মিশ্রিত। সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালরা বলেছিল, আমাদের মতো বউ ছেলে নিয়ে এলি না কেন? তাহলে তোর মন বসত।

—আমরা তো কামিয়া।

—কেমন?

—মালিকের কাজের গোলাম।

—কেমন করে?

—সে অনেক পুরনো কথা। এহি মানো যে তোমার বাবার বাবা দশ-বিশ টাকা করজ নিল তো আজও তুমি গোলাম খাটছ আর সেই করজ আজ হাজার টাকা।

সাঁওতাল পরগনার ছেলেরা অনেক প্রবীণ। অনেক জায়গায় গিয়েছে তারা খাটতে। নন্দ মুর্মু তো নবম শ্রেণী অবধি পড়েছে। সে বলে, এমন প্রথা আগেও ছিল আর এমন সব কারণেই আমাদের জাতির সিধু কানু যুদ্ধ করেছিল।

—কত আগে?

—ধরো দেড়শ বছর, বা কিছু কম। এর নাম ছিল বেগার প্রথা।

—উঠে গেছে?

—নাম বদলেছে, ওঠে নি। ভৈয়া! ঠিকেদাবেব কাছে পুবা হিসাব চাইবে যখন, আমবাও থাকব। চাইলেই হাঙ্গামা হবে, তবু যা পাই।

—শও টাকাব নোটেব কথায ভুলো না। মাটি পিছনে তো নেই, খাদেব কিনাবায পাহাড বনে গেছে।

লক্ষ্মণ ঠিকেদাব সবই জেনেছিল আব পবদিন ও দুশো টাকাব দুটো নোট বেঁধে ওদেব মৌত জাবি কবে দেয। দুটো নোট দেখে লোকগুলিব জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেযে যায যেন। খাদেব ভিতবে লোক, মানুষ মাটিব স্তূপে! অতজনেব ঠেলাঠেলিতে মাটিতে ধস্ নেমেছিল।

—ভৈযা! বাঁচাকে, আদমি বাঁচাকে—বিশালেবা আর্তনাদটি হঠাৎ চাপা পডে। কত পুরুষ, কতজন পিঠে বাচ্চাবাঁধা মেযে মানুষ, কতজন বালক-বালিকা, কে তাব হিসেব কবছে। ঠিকেদাব দুর্ঘটনা দেখেই গুরুত্ব বোঝে। ওভার্বাসিযাব তাকে ঠেলতে থাকে। ভাগ যাইও, চামডা বচাও, পুলিস আযেগি, লেবব ঝামেলা উঠেগি,—ভাগো! এখন যা ঝামেলা হবে, সে ম্যাও সামলানো তোমাব সাধ্য নয।

লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদাব বোঝে যে ওটা লাখ কথাব এক কথা।

—কে তোমাকে বলেছিল নোট দেখাতে?

ভাবলাম, লোভেব চোটে ওবা....

—ভৈযা! লোভে তো কাবো ভালো হয না। ঠিকেদাবী কামে এমন ভুল আব কোবো না।

কাবা এসেছিল? কাবা মাবা গেল? কোথায তাদেব ঠিকানা?

থাকে না, থাকে না কিছুই হিসেবে। যদিও এমন সব ঠিকেদাবেব মজুববা নতুন কামিযোতি প্রথায ওডিশাব জঙ্গল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, পলামুব গ্রাম থেকে ধানবাদ, ট্রাকে—ট্রেনে—বাসে নিযত চলে আব চলে।

এদেব জন্যে দিল্লিতে উচ্চপর্যাযে সম্মেলন হয, পাশ হয বহিবাগত

শ্রমিক বিষয়ক আইন। সরকারি মজুরি, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থা, আটঘণ্টা কাজ, এমন সব প্রতিশ্রুতি তাতে থাকে।

কোথাও মাটিতে ধস নামে, কোথাও কয়লাখাদানে, কোথাও বাড়ি ভেঙে পড়ে।

হিসেব নেই, ক্ষতিপূরণ নেই, একদিনের হইচইও কপালে জোটে না। আবার ঠিকেদার, আবার কাজের সন্ধান। পেটে খেতে পাব তো বাবু?

বাঁশে নোট বাঁধা রেখে মজুরদের তাতাবার চমকপ্রদ খবর হতে পারত, হয় না।

তবে লক্ষ্মণের খুব বদনাম হযে যায়, খুব। ইলাকা ছেড়ে পালাবার কালে ট্রেনে বসে ওর মনে হয়, এটা খুবই শান্তির কথা, যে লোকটি বহোত ঝুটঝামেলা পাকাতে পারত সেও মরে গেছে। বিশাল ভূঁইয়া। বিশাল এবং তার তিন সঙ্গীই গেছে।

আব একটা খুব আপশোসের কথা যে, যাকে তাকে হাজির করে, মৃতদের দাবীদার হিসাবে তাদের প্রমাণ করে ওই ওভারসিয়ার মৃতদের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিপূরণ বের করে নেয়, টাকাও মেরে দেয়।

এরকমই নিযম, এমনই হয থাকে।

আর এটাও খুব অদ্ভুত যে তারপরেও সেই ওভারসিয়ারই বাকি লেবারের হাতে পিটাই খায়, তাকেও পাওয়া যায় অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়।

ওভারসিয়ার শুধুই পিটাই খেল। লক্ষ্মণ থাকলে তাকে তো মেরেই ফেলত।

আর এ কেমন ভাগ্যের কৌতুক যে সে আসবে কোর্কি গাঁয়ে। আসবে লেবারের খোঁজে। এবং দেখতে পাবে বিশাল ভূঁইয়ার বিধবাকে।

গোহুমনি। গোহুমনিই বটে! খাওয়া নেই, মাখা নেই, শরীরে তবু ঝিলিক দিচ্ছে।

সমগ্র ব্যাপারটি লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদারকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে। তারপর তাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হচ্ছে। সেইজন্যেই ভকিলসাবের কাছে আসা।

এটা বড়ই লজ্জার কথা, যে বারে বারে তাকে ভকিলসাবের কাছেই দৌড়াতে হয়। ছোট-ঠিকেদার লাইনে সবাই বলছে এখন, তুমি শান্তিস্বস্ত্যেন করাও। কাল যে লাফাঙ্গা লাকড়া ছেলে সিনেমার টিকিট বেলাক করত এবং মা-মাসি থেকে ছোকরি যে কোনো মেয়ে দেখলেই "জিসকি বিবি মোটি" গাইত,—ছোট ঠিকেদারী পেয়ে আজই সে কত উন্নতি করে ফেলেছে। তুমি তো সুযোগ কম পাচ্ছ না। তোমার কিচ্ছু হচ্ছে না কেন?

বস্তুত, তুমি একটা ক্ষতি করছ দেশের। ঠিকেদাররা দেশ গড়ছে, ঠিকেদারী এখন ভারতের যুবসমাজের কাছে সব চেয়ে লোভনীয় পেশা। তোমাকে দেখলে তো লাফাঙ্গা-লাকড়াদের বুক দমে যাবে। তারা আর আসবে না ঠিকেদারী লাইনে।

তা, কেঁচে গণ্ডুষ করতে হলে নতুন ইলাকা সব চেয়ে ভালো। এসব কারণেই কেচকি চলে আসা। কিন্তু সেখানে বিশালের ঘর কে জানত?

এখন ইটভাটা বলো, কোনো নির্মাণ প্রকল্প বলো, বড় বড় কারখানা বলো সবইতো ঠিকাদারের লেবার। কত হিসেব রাখতে পারো তোমরা, কে কোথা থেকে আসে। যত গরিবের জন্যে দীপান্বিতার বিজ্ঞাপন, তত গরিবের নাভিশ্বাস। ততই হতাশ ও মরিয়া গরিব কাজের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ছে।

না, এখানে কেউ ঘটনাটির কথা জানে না।

লক্ষ্মণ এমন তীব্র আবেগে বিশালের কথা ভাবতে থাকে বলেই আজ রাতে মৃতের জগৎ থেকে অবয়ব নিয়ে উঠে আসে বিশাল ভুঁইয়া।

বারবারই সে আসতে চাইছে, আসছে। কিন্তু এখনো সামনে

আসছে না। মৃত ও জীবিতের জগতের মধ্যেকার সীমারেখা বড়ো দুর্ভেদ্য।

বিশাল ভুঁইয়া মৃতলোক থেকে ফিরে আসতে পারত কি না কে জানে! কিন্তু ঝালো তো তাকে কামনা করত, সবসময়ে কামনা করত। সাতবান চাইত সে ফিরে আসুক, মোরি চাইত সে ফিরে আসুক।

সকলের মিলিত আবেগের তীব্রতা বিশালকে ডাকতে থাকে। বিশাল সে ডাক শুনতে পায়। মৃত যদি জীবিতের কাছে আসতে চায়, তাহলে সে অন্ধকারই খুঁজবে। অন্ধকারের মতো বন্ধু কে আছে?

লাসা টোলির জগতে শুরু হয় নড়াচাড়া। লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদারের কথায় কাজ হয়। নওনেহাল, ভানুপ্রতাপ, গজানন, রামপরতাব এমন সব মালিকদের সঙ্গে বসে সমুন্দর সিং।

—আমরা কাজ দিতে পারছিনা সব-সময়ে। আকাশ জল না দিলে চাষ নেই, কাজও নেই।

—হ্যাঁ, সব জায়গাতে একই হাল।

—সিঁচাই চাই, সিঁচাই।

—এমন সিঁচাই, যাতে সম্বৎসর জল পাই।

—জল পেলে তিনটে চাষ হবে।

—কামিয়ারা তো কাঠ কাটতে, পাথর ভাঙতে, বালির ঠিকেদারের হয়ে বালি তোলাতে যাচ্ছেই।

—হাঁ হাঁ, যাচ্ছে।

রামপরতাব যে কোনো কথাই খুব রেগে বলে। সে ঝেঁঝে উঠল, আর এদিক-ওদিক থেকে পাঁচ রকম বুদ্ধি নিয়ে আসছে। মাথা গরম করছে।

গজানন ঠাণ্ডা মাথার লোক। সে বলল, আজকাল তো আমার নাগর। মোটে ছিঁড়ে না। বেটাদের পিটাতাম; সেসব তো এখন বন্ধ।

ভানুপ্রতাপ মুখিয়া এবং সময়ের তালে তাল দিয়ে চলতে জানে। সে বলল, এটা ভালো যে আমরা পিটাই না। পিটাই মারাই যারা অতিরিক্ত করেছে, তাদের কারণেই কাগজপত্রে খবর বেরিয়ে পলামুর নামে কলঙ্ক উঠেছে।

সমুন্দর বলে, আমাদের মাঝে একতাও নেই, ঔর কামিয়ারা তার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। পাঁচ জায়গায় খাটতে গেলে বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়, বেকার বদবুদ্ধি মাথায় ঢোকে। এ ঠিকেদার সকলকে একই জায়গায় রাখবে, শাসনে থাকবে...দুই-তিন মাস...

—যারা যারা যেতে চায়, যাক।

—আরো কথা ছিল।

—বলুন না।

—এমন হতে পারে, যে ফরেস্ থেকে ওই মামলাধীন জমি নিয়ে নিল।

—নিয়ে নিল?

—হতে পারে। জরিপে যদি দেখা যায় যে ওটা সরকারেরই ছিল, তাহলে নেবে।

—এ আপনার কোনো কৌশল।

ভৈয়া! এ প্রসঙ্গে আমি কোনো কথা বলব না। আপনারা যে যেমনভাবে পারবেন, খবর নিবেন।

—আপনার কাছে কোনো খবর আছে?

—শুনছি যে এমন হতে পারে।

—হলে কী হবে?

—ক্ষতিপূরণ পাব?

—সরকার জমি নিলে তো ক্ষতিপূরণ পাবারই কথা। কিন্তু এমন মামলা ও জমিতে যে, দেবে কাকে?

—মালিককে।

—এখানে কে মালিক? এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যত দাবীদার সবাই নিজকে নিজকে দাবীদার বললে কিছুই হবে না।

—তবে কী করা যাবে?

—নিজেরা ভাবুন, খবরতালাশ নিন। এক হতে পারে যে সবাই মামলা উঠাব, একসাথে ক্ষতিপূরণ বেটে নিব। কিন্তু রোহিত বর্মা যদি ল্যান্ডরেভিনিউ কমিশনে আসে, তাহলেই মুশকিল।

—কেন?

—পুরানো কাগজ ঘাঁটলে দেখা যাবে ও জমি আদিবাসীদের। আর কোন আদিবাসীদের?

সবাই এ সংবাদে সবিশেষ চমকিত হয। রোহিত বর্মা অত্যন্ত সৎ, অত্যন্ত কড়া ও পাকা অফিসার। সে যে কোনো সময়ে দেড়শো বছরের পুবানো দলিল বের কবতে পারে। আদিতে ওই জমি আদিবাসীব থাকলে পববর্তী সকল হস্তান্তরই আইনের চোখে বেআইনি। খুবই সুখের কথা যে, আইনের একদা পবিত্র চোখে দীর্ঘকাল ছানি পড়েছে, গ্লুকোমা হয়েছে।

—আদিবাসীর...কোন্ আদিবাসীর, সবপঞ্চজি?

—পারহাইয়া ও নাগেসিযাদের। কেচকি খণ্ডই তাদের। আমরা তো কোনো কোনো জমির খাজনা এখনো মোরির বাপের নামে দিই। আর যে নাগেসিয়ারা পাহাড়ের ঢালে থাকছে পাহাড়িয়া ইঁদুরের মতন, ওরা ওই জমির মালিক।

—তবে তো জল বহুত ঘোলা।

—আমরা একতাবদ্ধ হয়ে থাকলে ঠিক বেরিয়ে যাব, লেকিন সবই সকলে ভাবুন।

সকলেই বোঝে যে এসব গোপন রহস্য প্রকাশ করে সরপঞ্চ হাতে পেল তুরুপের তাস।

গজানন বলে, হাঁ হাঁ কাজ করতে যাক। আপনি ওই গোহমনিকে পাঠান। ও থাকলে পরে গ্রামে ঘরে ইজ্জত রাখা রাহোত্ হি মুশকিল।

সমুন্দর বলে, তা কি জানি না? মাগী এমন সতীপনা দেখাচ্ছে যেন ও জানকী মৈয়া। কোনো ছোঁড়াটোড়া যদি ফুসলেও ওকে বের করে নিত তো বাঁচতাম।

ভানুপ্রতাপ বলে, কোনো মতে টাউনে নিতে পারলে তো ভালো দামে বিকে যাবে।

নওনেহাল মুচকে হেসে বলে, ঠিকেদারজি ইচ্ছে করলেই পারেন। আপনার তো সেবা ধরম করতে একটা লোক দরকার হবে। গ্রামে এসে ঠিকদার কি উপবাসী থাকবে?

লক্ষ্মণ সিং বলে, তোবা তোবা! ও সব কথা বলবেন না। তবে কাজের কথা বলব। আর কাজের কথা পাকা হলে মেয়েদের জন্যে শাড়ি ছেলেদের জন্যে ধুতি দেব। তাতেও অনেক কাজ হয়।

—ও গোহমনি! সাবধানে যাবেন কাছে।

—কাটতে পারে, এমন কাছে যাব না।

এভাবেই কেচকি ও লাঠা টোলিতে অবস্থা বদলাতে থাকে। যারা এই সমগ্র ভূখণ্ডের মালিক, সেই নাগেসিয়া ও পারহাইয়াবা রাজী হয়ে যায় লক্ষ্মণের সঙ্গে যেতে। মোরি বলে, বাসনি! তুই যা। আমি থাকি, বাচ্চাদের দেখব এখন।

কামিয়ারা বেশ কিছু লোক রাজী হয়। ঘরে তো উপোস। সেখানে কেমন কাজ হয় দেখে আসি।

রাজী হয় না সাতবান, রাজী হয় না গোহমনি।

লক্ষ্মণ সিং তার কথা রাখে। যারা যাবে, প্রত্যেককে দেয় নতুন ধুতি, নতুন কাপড়, পরিবার খরচার জন্যে দশ টাকা। দামগুলি লিখে রাখে নামের পাশে। একদিন এগুলি পাওনা থেকে কাটান যাবে। আজ দেওয়া হয় নিঃশর্ত দান হিসেবে।

গোহ্মনির জন্যে একটি হলদে কাপড় নিয়ে ও গোহ্মনির ঘরে যায়। আস্তে আস্তে বলে, কথা ছিল।

—কী কথা?

—কি করে শুরু করি...

—লাজ লাগছে?

—সত্যিকারের গোহ্মনির মতো করিস না তো? কাজ করতে যাবি না কেন?

—আমার ইচ্ছে।

—ঘরে পড়ে শুকাবি?

—কপালে থাকলে তাই হবে।

—আমাকে দেখাশুনা করার কাজ করবি?

—কী করতে হবে?

—আমি তো ঠিকাদারিতে ব্যস্ত থাকব সারাদিন। এই রেঁধে দিল..একটু দেখলি...

গোহ্মনি চোখ কুঁচকে কি ভাবে।

—তোকে টাউন দেখাব, টাউন।

—টাউন..দেখি, ভেবে দেখি।

—এই কাপড়টা...

—না বাবু! পনেরো টাকার কাপড়, হাত নেই, বহর নেই, এ তো আমরা হাটেই কিনি।

—ভালো কাপড় নিবি, ভালো কাপড়?

—তুমি দেবে?

—নিশ্চয়!

গোহ্মনি হাসতে শুরু করে। বলে, যাও বাবু। এখন ছেলেদের জ্যেঠা আসবে।

—আমি ভালো কাপড় আনব, তোকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

—কেন ?

—তোকে দেখে...

—বুঝেছি, এখন যাও।

পবে সব কথা শুনে সাতবান বলে, এটা ঠিক হযনি। ও হযতো আবাব আসবে।

—আসুক। এবাব এলে ওব গলাটা কেটে ছেলেমেযে নিযে পালাব।

—পালাবি কোথায, লাঠ্যা ছেড়ে ?

—পালাব না !

- না। আব এখন আমবা দুবলা হযে গেলাম। কত লোক চলে যাচ্ছে। মালিকেবা না খচডাই কবে।

— কামিযা থেকে ভিখাবিও স্বাধীন।

—হাঁ, তাই তো।

- এখন মালিকবাই বলছে, যাও! বাইবে কাজ কবো। কেন না তাবা কাজ দিতে পাবছে না। না কাজ, না লুকমা, যাও তোমবা ঠিকেদাবেব সঙ্গে। আব তোমাব ভাইবা কাজ নিযে চলে গেল বলে কত দোষ হল।

তোব জন্যে ডব লাগছে এখন।

-কেন ?

এমন একপাশে ঘব! আমি তো বিশাল নই। সোনা আব দানিব জন্যে জীবনটা দিতে পাবি। তাতে কি তোদেব জীবনটা বাঁচবে ?

- ওবা গ্রাম ছেড়ে চলে যাক। তখন মোবি, বাসনিব ছেলেমেযে তুমি, সব এখান থেকো।

—তাই থাকতে হবে। ঠিকাদাবটা এলে ?

—আমি ঠেকাব।

সাতবান চলে যায। মাচানেব নিচে ছাগল। মাচানে সোনা ও

দানিব পাশে গোহমনি। প্রত্যেহেব মতে আজও সে প্রার্থনা কবে, মৃতলোক থেকে ফিবে আসুক বিশাল।

সবাই বলেছে যে, বিশাল মৃত। কেউ বলেনি যে বিশালেব মৃতদেহ দেখেছে। গ্রামেব শম্ভু বাওত ছিল সেখানে। সে বলে, সবই দলিত ও পিষ্ট দেহ। তবে লম্বা চওডা জনই বিশাল।

সে বিশ্বাস কর্বেনি, সাতবান বিশ্বাস কর্বেনি। তবু ধবে নেযা গেল যে সে মৃত।

এমন কাতব হযে এসো! এসো! বললে তো মৃত লোক দেখা দেয। গোহমনি তাই কাতব ব্যাকুলতায বিশালকে ডাকে আব ডাকে। তাবপব কাদে, তাবপব ঘুমায।

আব বিশাল আসে।

মৃত ব্যক্তি আসতে পাবে অন্ধকাবে। সে অন্ধকাবে আসে। দিনে লুকিযে থাকা, অন্ধকাবে পথ চলা। খেযে না খেযে পথ চলা। চলতে চলতে আজ ভোবেই পৌঁছে গিযেছিল এই জমিতে। কাশেব ঝোপেব মধ্যে পডে থেকেছে মডাব মতন। জল-পিপাসায ভাজা ভাজা হযেছে। সন্ধে হতে তবে দহে নেমে দুর্গন্ধ থকথকে জল খেযেছিল খানিক। সতু ওব কাছে আছে। কিন্তু সত্তু খেলে তো জল চাই। ঘবেব কাছে এসে এভাবে আটকে থাকা বড কষ্ট।

বাত হল। আকাশে তাবাগুলো ঘুবছে। বিশাল পোঁটলাটি বগলদাবা কবে নিচু হযে এগোয। কাছে আসছে ঘব, কাছে আসছে।

—সোনাকে মৈযা!

গোহমনি চোখ খোলে না। একেবাবে সাডা দিতে নেই। যদি অন্য কেউ হয?

—এ সোনাকে মৈযা! এই ঝালো, কী খচডাই কবছিস?

— আমি...আমি

—তুমি!

—নয় তো কে রে গাধী? বুড়ি বকরি, খচড়ি কাঁহিকা? গাধী! খচড়ি! বুড়ি বকরি! কত চেনা-চেনা শব্দ, কত চেনা গলা। হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে ঝালো দরজা খোলে ও বিশালের গলা ধরে ঝুলে পড়ে, তুমি...। তুমিই তো! তুমিই তো!

—পানি দে পহিলে! পিয়াসে ছাতি ফেটে গেল।

এক ঘড়া জলই বিশাল খেয়ে নেয়। তারপর ঝালোকে বলে, বাইরে চল্ বাচ্চারা উঠে যাবে।

—উঠুক!

—না না, বাইরে চল্।

ঝালো হারিকেন নেয়। দুজনে হাত ধরাধরি করে দৌড়ায়। বড় বড় কাশঝোপ, কাঁকড়, পাথর জমি, বিশাল ঝালোকে জড়িয়ে ধরে।

—তুই ভেবেছিলি, আমি মরে গেছি?

—ইস্! কক্ষনো বিশ্বাস করি নি। সোনার জোঠা করে নি, মোরি করে নি।

—হাতের সোহাগ চুড়ি তো ভেঙেছিস।

—খবরটা এল..পাঁচজনে ভেঙে দিল..চুড়ি ভাঙলে কী হবে? চুড়ি তো পরা যাবে আবার।

—তা যাবে।

—কী হয়েছিল?

—আরে! মাটি চাপা পড়ে তো আমি মরি নি। কেমন করে বেঁচেছিলাম তাও জানি না। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল এগারো দিন পরে। তখন আর সেই জায়গায় ঢুকতে পারি নি। একে তো রটিয়ে দিয়েছে যে বিশাল ভূঁইয়া মরে গেছে।

—শম্ভু রাওত বলল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। কেন কি শম্ভু রাওত বলল, ও তুমিই। লেকিন মুর্দার মাথায় চুল বহোত কম।

- -তাহলে সেই সাঁওতাল হবে।

—সোনার জোঠা আর আমি! আমাদের মনে খুব শান্তি হয়ে গেল। তোমার মাথাভরা চুল ঘন কত! কিন্তু তারপরে তিন বছর কোনো পাত্তা নেই, তাতেই...

—ভাবলি যে এবার মরেছে, তবে সাঙ্গা করি।

—ও! দশটা সাঙ্গা করতে পারতাম।

—করলি না কেন?

- তুমি এসে ঢিপাবে না?

- আরে, আমি তো সে কাজের জায়গায় ঢুকতেই পারছি না। পুলিশে পুলিশে ঘেরাও। আমি কাছাকাছি লুকিয়ে থাকছি যে, ঠিকেদারকে মারব, আর ওভারসিয়ারকে। তা ঠিকেদার তো ভেগে গেছে। ওভারসিয়ার বেটা কোম্পানি থেকে মোটা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে লেগেছে।

তোমার নামেও?

- সবার নামে। ধরলাম তাকে। টাকা দাও, নয় তো জানে মেরে দেব। সে চেঁচাতে লেগে গেল। দিলাম মাথায় রড বসিয়ে। বাস! মরে গেল বলে মালুম হল। এখন বুঝলাম যে মরতে পারলে কোম্পানি তো আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে, বাস ভেগে পড়লাম।

পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে?

হাঁ রে! কোথা টাটানগর, কোথা কলকাতা, কোথা পাটনা, কাজ পাচ্ছি তো চলে যাচ্ছি। তারপর সাতদিন আগে রাঁচিতে ওই ওভারসিয়ারকে দেখলাম। এই রোগা, লাঠি ধরে যাচ্ছে। ও আমাকে দেখেনি। কিন্তু একে তাকে পুছতাছ করে জানলাম ওই হচ্ছে হরবিশাল ওভারসিয়ার। দেখ কাণ্ড! ও মরে নি। আর আমি যেন ভূতের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে..

— এতদিন লাগল আসতে?

এখানকার হালচাল জানি না। ওই ওভারসিয়ার আব ঠিকেদার এখানে কোনো ঝামেলা করেছে কিনা জানি না। তাতেই সাবধানে সাবধানে..

—যাক্! তুমি তো এসে গেছ।

— হ্যাঁ, ঘবে চল্।

— চলো।

-- দাদাব ঘবে যাই। ছেলেরা দেখলে সকালে হাললা তুলবে।

- যাবে। তাই চলো!।

-—সেও তো বহোত ভাবছে, তাই না?

- বহোত্। ঠিকেদার।

—চল্, পবে শুনব।

সাতবানেব ঘবে চলে যায় ওবা। সাতবানে বলে, সত্ত্ব খা, ঘুমা। কাল কথা হবে।

মালিক সেই শও টাকাব দাম উঠাবে।

-- কিসের শও টাকা? কালই বলে দিচ্ছি। না কেউ ঠিকেদাবেব সঙ্গে যাব, না কামিযৌতি খাটব আব। এখন তুই এসেছিস বুকে সাহস বেড়ে গেছে আমাব, জানলি বিশাল!"

– কামিযৌতি খতম কববে?

কোথাও কোথাও কবেছে। বহোত চেষ্টায় কবেছে। আমবাই বা পাবব না কেন?

- এখন তো খুব আকাল।

– আমবা কবে খাই?

-- হ্যাঁ, যা কবতে হবে, তা তাডাতাডি..

---মাধো সিংযেব কাছে যাই আগে।

– তাডাহুডো কবে লাভ নেই দাদা। এখন আমি এসে গেছি, এবাবে সব কবে ফেলব।

—হ্যাঁ, মালিকরা আছে...

—খবর নিয়েছি টাউনে। সকলের টিপ দিয়ে দরখাস্ত একটা সদরে।

—অনেক, অনেক কাজ...

বিশাল ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েক ঘণ্টা আগেও সে ছিল মৃত, এখন সে জীবিত। সাতবান ও ঝালো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবাই বলাবলি করত, সাতবান ও ঝালো কেন ঘর বেঁধে নেয় না। এমনটা তো অস্বাভাবিক নয়। একা সাতবান ও ঝালো জানত যে তা হয় না, হতে পারে না। কেননা ওরা কখনো মানে নি যে বিশাল মরে গেছে।

—ঘব যাক্ সোনার মৈযা, ঘর যাক।

—দোবে আগড় দিক সোনার জোঠা, আগড় দিক।

—সোনা যেন আমার থালাটা নিয়ে আসে।

না। এখন থেকে ও ঘরেই খাওয়া দাওযা হবে।

সাতবান বিড়ি ধরায়। ঝালো বেরিয়ে আসে। এ ভাবেই একটি নিরুচ্চার, ভাবি প্রগাঢ হৃদয সম্পর্কের অবসান ঘটে। সাতবান এতদিন বড যত্নে, বড় স্নেহে ঝালোদের আগলে রেখেছিল।

পবদিন বেলা হতে থাকে, নতুন বঙরুট কুলি রেজারা তখনো আসে না। সবাই নতুন কাপড পরেছে। তারপর কেন গেছে গোস্বমনিদের বাড়ি, কে জানে!

ওই টাকা, আগামের টাকা দিযে চাল নুন তেল মশলা কিনেছে। মোবি পারহাইয়া একটি শুওর বেঁধে টেনে নিয়ে গেল। ঢোলই বা বাজছে কেন? সমুন্দর হতাশ ক্রোধে বলে, পোকামাকড়ের মত। ওখানে বোধহয সাতবান আর গোস্বমনির সাঙ্গা লাগিযে দিল। চলুন তো দেখা যাক? এদের ভালো করবে কে? লাথ আর পয়জারেই ভালো থাকে ওরা।

ঢোলক বাজাচ্ছে, গান হচ্ছে, সবই দূর থেকে শোনা যায়। নওনেহাল, ভানুপ্রতাপ, সমুন্দর, লক্ষ্মণ সবাই এগোয়। ভানুপ্রতাপ বলে, কাজে চলে যাবে তাই খানাপিনা করে নিচ্ছে। এরা তো যা পায় তাই উড়ায়, তাতেই দুখ্ ঘুচে না।

গোহমনির উঠোনে আনন্দ, মহা আনন্দ। গোহমনির হাতে চুড়ি, দু কপালে সিঁদুর। মোরি বুড়ো শরীর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে সাতবানের সঙ্গে নাচছে। বেশ কিছু বোতল চলেছে ও চলছে। সমুন্দর মাথা নাড়ে। সাতবান আর গোহমনি। সেই সাঙ্গাই করলি। মাঝে তিন বছর সতীত্ব দেখালি।

তারপরই ওরা চমকে, থমকে দাঁড়াল। ঢোলক গলায় প্রমত্তচরণে প্রসন্ন হেসে এগিয়ে আসে বিশাল ভুঁইয়া।

—বিশাল, তুই!

বিশাল এখন ভীষণ মাতাল।

—হাঁ মালিক। সেই শও রুপেয়ার কোনো হিসাব দিব না। আমার কামিয়ৌতি খতম।

এবার সে লোমশ, লম্বা হাতটি বাড়ায়। আইও, আইও বাবা লছমন সিং ঠিকেদার। থোড়া হিসাব তোমার সঙ্গে তো আছে। সতেরোটা জান লছমনবাবু?

লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদার বোঝে, তার নিয়তি তাকে ধরে ফেলেছে। সে সমুন্দরের দিকে চায়। লাঠা টোলির লোকেরা মালিকদের, লক্ষ্মণকে ঘিরে ঘন হয়ে চেপে আসে। সকলকে জ্যান্ত গোহমন মনে হয়। নিঃশ্বাসে মৃত্যু।